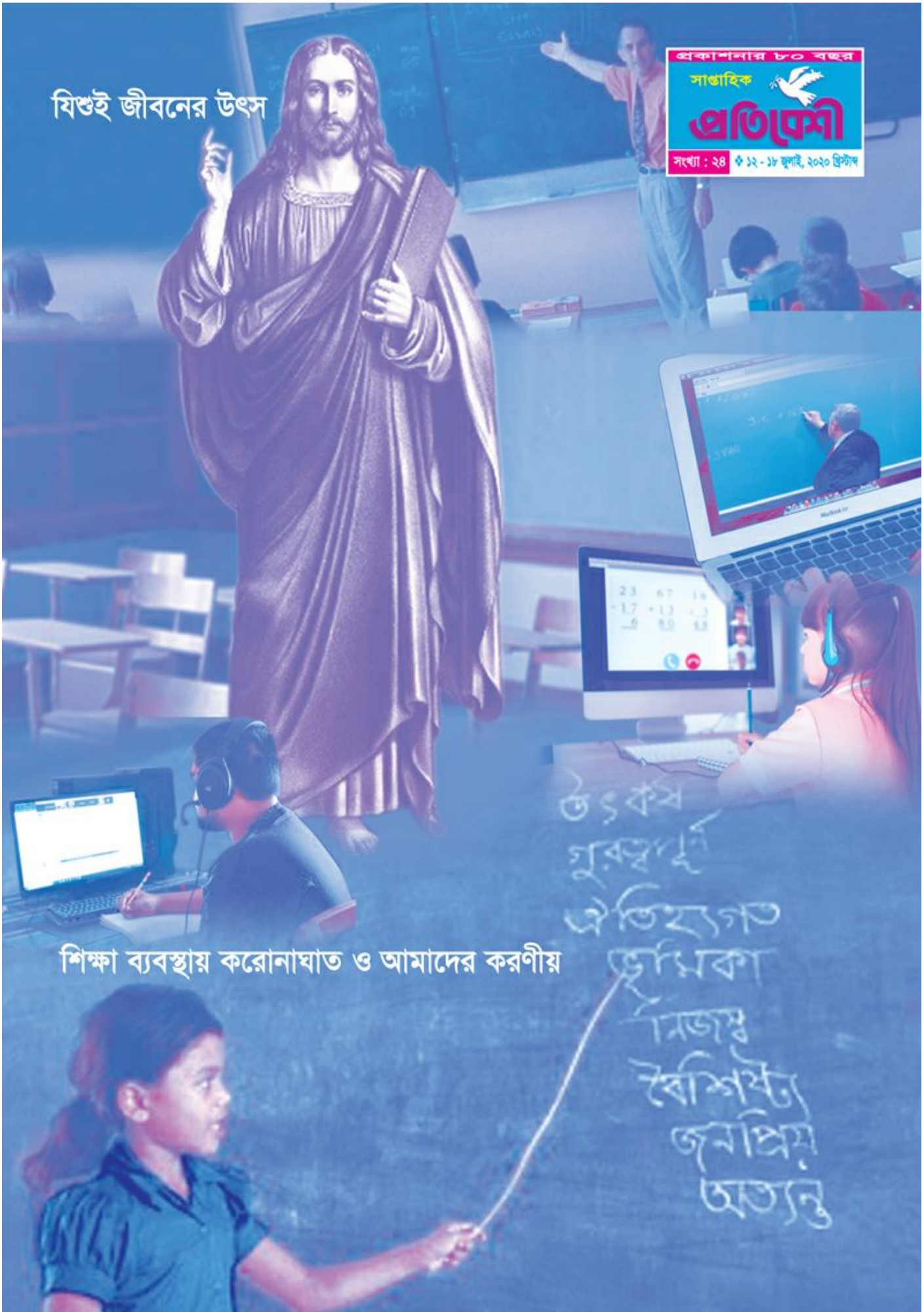

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৪ ❖ ১২ - ১৮ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

যিশুই জীবনের উৎস

শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনাঘাত ও আমাদের করণীয়

জুলাইয়ের ১ম শনিবার	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১১ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার	বিশ্ব শিশু দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তিদিবস
৭ জানুয়ারি	প্রভুর যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারিয়ার পর্ব,
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১১ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
৫ এপ্রিল	তালপত্র রবিবার
৯ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১০ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
১২ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১৯ এপ্রিল	ঐশ করুণার পর্ব
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
৩ মে	বিশ্ব আহ্বান দিবস
২১ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
৩১ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৭ জুন	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৩ জুন	পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব
১৪ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ রক্তের মহাপর্ব
১৯ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২৯ আগস্ট	দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষক দূতের মহাপর্ব
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১৫ নভেম্বর	বিশ্ব দরিদ্র দিবস
২২ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৯ ডিসেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৩০ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

বিশেষ ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র প্রিয় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী, সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। করোনাভাইরাস-এর সঙ্কটকালীন সময়ে আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমরা দৃঢ় আশাবাদি। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে বিতরণ কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত ও সংকুচিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের সব স্থানে স্বাভাবিক বিতরণ সম্ভব হচ্ছে না বলে দুঃখিত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিঘ্রই স্বাভাবিক নিয়মে বিতরণ করার চেষ্টা করবো।

-সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৪
■■■■■ ১২ - ১৮ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ২৮ আষাঢ় - ৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা

করোনাভাইরাস সারাবিশ্বেই এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম হয়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্র শুধু নয়, সমগ্র মানব জীবনকেই স্তব্ধ ও স্থবির করে দিয়েছে ক্ষুদ্র এই ভাইরাসটি। জনসমাবেশ এড়িয়ে ঘরে বন্দি থেকেই একে জয় করার চিন্তা করেছিল অনেকে। কিন্তু তাতেও কোন সফলতা আসছে না। এর প্রকোপ, আক্রান্তের হার ও আতঙ্ক বেড়েই চলছে। এমনিতর অবস্থায় বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠতে এবং জীবন-জীবিকা সচল রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ দিয়েছে সরকার। কল-কারখানা, বিভিন্ন শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রতিষ্ঠানগুলো নেমে পড়েছে জীবনযুদ্ধে। কিন্তু ব্যতিক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে। কোমলমতি শিশু এবং দেশের ভবিষ্যত নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিগত মার্চ মাস থেকে এখনো পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যা যথোচিত। কবে নাগাদ তা আবার স্বাভাবিক কার্যক্রমে আসবে তা কেউ বলতে পারছে না। যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এক অনিশ্চয়তা। সরকারও সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ও এ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে টানাপোড়ন সম্পর্ক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে সরকার ও বেসরকারি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু যেখানে ঢাকা শহরের মতো মেগাসিটিতে ইন্টারনেটের স্পিড অত্যন্ত দুর্বল এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুত চলে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা সেখানে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কেমন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েই তা করা দরকার। শোনা যাচ্ছে শিক্ষকগণ তাদের ইচ্ছা মতো সময়ে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দেন না। যার ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাশ করতে নিরুৎসাহিত হয়। তাই যে কারণে ক্লাশ দান তা একেবারেই বিফলে যাচ্ছে। তাই শিক্ষাদান কার্যক্রমে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা একান্তই দরকার। যে পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করবেন। শিক্ষা লাভ করে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি ও সার্টিফিকেটই অর্জন করবে না। কিন্তু অর্জন করবে জীবনকে সুপথে পরিচালনা করার সম্যক রসদ। আর তাই প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রতিকূলতাকে জয় করতে শিক্ষার্থীকে পারঙ্গম করে তুলে।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবন পরিবর্তনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। শিশু ছাড়া অন্যান্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে এতো টেনশনে পরতে হতো না যদি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করা যেতো। প্রকৃত শিক্ষা ভালোতে সাড়া দিতে একজন ব্যক্তিকে আলোড়িত করে। আমাদের বেশিরভাগের যদি প্রকৃত শিক্ষা থাকতো তাহলে এই সংকটকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনেক কিছু করতে পারতাম। শিক্ষা কার্যক্রমও ঘরে বসে করা যেতো। চিন্তা করতে হতো না শিক্ষার্থী নকল করবে বা অভিভাবকেরা সন্তানদের সহায়তা করবে। সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষিতজনের চেয়ে কম পড়াশুনা জানা কিন্তু জীবন ও নৈতিকতাবোধে শাণিত ব্যক্তিরাই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি। বাংলাদেশে এই ধরনের মানুষের বড় বেশি অভাব। করোনাভাইরাস সংকট আমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষিত হবার একটি সুযোগ দান করছে। যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অন্যকে ঠকাবে না, নিজের আখের ঘুচাবে না, দুর্নীতিবাজের সাথে আপোস করবে না কিন্তু দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করতে দ্বিধান্বিত হবে না। আসুন, আমরা সকলে নিজেদেরকে প্রকৃত শিক্ষার আলোতে নিজেদেরকে আলোকিত করি। ✝

মঙ্গলবাণী

'তোমরা কান পেতে শুনেও বুঝবে না, তাকিয়ে দেখেও দেখতে পাবে না। কারণ এই জাতির মানুষেরা অন্তরে স্থূল হয়ে গেছে, কানে খাটো হয়ে গেছে; চোখ বন্ধ করেই বসে আছে তারা।' (মথি ১৩: ১৮-১৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১২ জুলাই, রবিবার
ইসাইয়া ৫৫: ১০-১১, সাম ৬৫: ৯-১৩, রোমীয় ৮: ১৮-২৩, মথি ১৩: ১-২৩ (অথবা ১৩: ১-৯)

১৩ জুলাই, সোমবার
সাধু হেনরী, স্মরণ দিবস
ইসাইয়া ১: ১০-১৭, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১,২৩, মথি ১০: ৩৪–১১: ১

১৪ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধু কামিলুস দ্য লেলিস, যাজক, স্মরণ দিবস
ইসাইয়া ৭: ১-৯, সাম ৪৮: ১-৭, মথি ১১: ২০-২৪

১৫ জুলাই, বুধবার
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
ইসাইয়া ১০: ৫-৭, ১৩-১৬, সাম ৯৪: ৫-১০, ১৪-১৫, মথি ১১: ২৫-২৭

১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার
কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া, স্মরণ দিবস
ইসাইয়া ২৬: ৭-৯, ১২, ১৬-১৯, সাম ১০২: ১২-২০, মথি ১১: ২৮-৩০

১৭ জুলাই, শুক্রবার
ইসাইয়া ৩৮: ১-৬, ২১-২২, ৭-৮, সাম (ইসাইয়া) ৩৮: ১০-১২, ১৬, মথি ১২: ১-৮

১৮ জুলাই, শনিবার
মিখা ২: ১-৫, সাম ১০: ১-৪, ৭-৮, ১৪, মথি ১২: ১৪-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৯৭ ব্রাদার ফেলিক্স শোয়েন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফাদার সিসারে পেসকে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী ভির্জিনিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)

১৪ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৮৯৯ সিস্টার লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯০২ ফাদার অ্যাডলফ্ গওডন সিএসসি
+ ১৯০৭ ফাদার কার্লো রোহ্ পিমে
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম. তেরেস ডু টি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৫ ফাদার আম্পেলিও গাসপারোত্তো এসএক্স (খুলনা)

১৫ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার ডরথী রোজারিও এলএইসসি (চট্টগ্রাম)

১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ ফাদার যোসেফ পোয়ারিয়ে সিএসসি
+ ২০০৯ ফাদার জন বার্কমায়ার সিএসসি
+ ২০১৮ ফাদার জ্যোতি গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী সিসিলিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)

১৭ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৭০ ফাদার ফর্চুনাতো ডি পাওলি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফাদার গুইডো মার্গুত্তি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ ব্রাদার জর্জ নোয়াকস সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সিস্টার মেরী মাইকেল পিসিপিএ

১৮ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৮৬ সিস্টার সিলভিও ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০১ ফাদার যোসেফ এ. ডি' সুজা এসজে (ঢাকা)
+ ২০০৯ সিস্টার এনানসিয়েটা ড্রাগনি পিমে (দিনাজপুর)

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কিভাবে হয়?

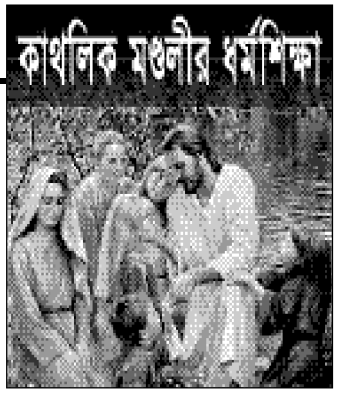

১১৯৫: পূজন- বর্ষের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে সাধু - সাধ্বীদের স্মরণোৎসব - প্রথমত ঈশ্বর-জননী, অতঃপর প্রেরিতদূতগণ, সাক্ষ্যমরগণ এবং অন্যান্য সাধু- সাধ্বীদের স্বরণোৎসব - পালন করে এই জগতের মণ্ডলী প্রকাশ করে যে, সে স্বর্গীয় উপাসনার সঙ্গে সংযুক্ত। মণ্ডলী খ্রিস্টকে মহিমান্বিত করে, কারণ খ্রিস্ট তাঁর গৌরবান্বিত ভক্তদের মধ্যেই তাঁর পরিত্রান সাধন করেছেন; এদের সুদৃষ্টান্ত মণ্ডলীকে পিতার দিকে, তাঁর যাত্রাপথে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করে।

১১৯৬: প্রাহরিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশ্বাসীগণ সামসঙ্গীত প্রার্থনায়, ঐশবাণী মননে এবং প্রশংসাগীতি ও আশীর্বাদসমূহের অনুধ্যানে, আমাদের মহাযাজক খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হন, যাতে তারা তাঁর অবিরাম ও সার্বজনীন প্রার্থনার সাথে যুক্ত হতে পারে, যে প্রার্থনা পিতা ঈশ্বরের মহিমা গায় এবং সারা বিশ্বের জন্য পবিত্র আত্মাকে যাচ্না করেন।

১১৯৭: খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের সত্যিকারের মন্দির, "সেই স্থান, যেখানে তাঁর মহিমা বিরাজ করে"। ঈশ্বরের কৃপায় খ্রিস্টভক্তগণও পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে উঠে, তারা হয়ে উঠে জীবন্ত প্রস্তর যা দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী গঠিত।

১১৯৮: ইহকালীন অবস্থায় খ্রিস্টমণ্ডলীর কিছু কিছু স্থান প্রয়োজন যেখানে ভক্ত মণ্ডলী একসাথে মিলিত হতে পারে। আমাদের গির্জাগুলো, পবিত্র স্থানগুলো পুণ্য নগরী বা স্বর্গীয় জেরুসালেমের প্রতিচ্ছবি যার দিকে আমরা আমাদের তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হচ্ছি।

১১৯৯: এই গির্জা বা মন্দিরগুলোতেই খ্রিস্টমণ্ডলী পবিত্র ত্রিত্বের মহিমার উদ্দেশ্যে উপাসনা অনুষ্ঠান সম্পাদন করে থাকে, ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে ও তার স্তুতিগান করে, তার প্রার্থনা উর্ধ্বে উত্তোলন করে, এবং জনগনের মধ্যে সংস্কারীয়ভাবে উপস্থিত খ্রিস্টের যজ্ঞাবলি নিবেদন করে। এই গির্জাগুলো এমনও স্থান, যেখানে ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা করা হয়।

ধারা ২
আনুষ্ঠানিক উপাসনার বৈচিত্র ও রহস্যের ঐক্য

উপাসনা- অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যসমূহ এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর সার্বজনীনতা

১২০০: জেরুসালেমের প্রথম খ্রিস্টমণ্ডলী থেকে খ্রিস্টের পুনরাগমন পর্যন্ত, ঈশ্বরের মণ্ডলীসমূহ প্রৈরিতিক বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে একই নিস্তার- রহস্য সর্বত্র উদ্যাপন করে আসছে। উপাসনার উদ্যাপিত রহস্যটি অভিন্ন, কিন্তু এর উদ্যাপনের রীতি বিভিন্ন।

১২০১: খ্রিস্টের রহস্য এতই অসীমরূপে সম্পদশালী যে, উপাসনা অনুষ্ঠান তা একটি ঐতিহ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশ হয় না। এই উপাসনা- পদ্ধতিগুলোর বিকাশ ও উন্নয়নের ইতিহাস এদের পরস্পরের সম্পূরকতার সাক্ষ্য বহন করে। খ্রিস্টমণ্ডলীগুলো যখন ধর্মবিশ্বাসের একাত্মতায় এবং বিশ্বাসের সংস্কারসমূহে নিজ নিজ আনুষ্ঠানিক উপাসনার এতিহ্যগুলো অনুযায়ী জীবন-যাপন করেছে, তখন তারা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে, এবং ঐতিহ্যের প্রতি ও সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর কর্মদায়িত্বের প্রতি বিশস্ততায় বেড়ে উঠেছে।

ফাদার শিশির ডমিনিক কোড়াইয়া

সাধারণ কালের ১৬ তম রবিবার

১ম পাঠ : প্রজ্ঞা; ১২: ১৩, ১৬-১৯

দ্বিতীয় পাঠ : রোমীয় ৮: ২৬-২৭

মঙ্গলসমাচার: মথি ১৩: ২৪-৪৩

সবাইকে সাধারণকালের ১৬তম রবিবাসীয় উপাসনায় স্বাগত জানাই। এই জগৎ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের যেমন রয়েছে মহান পরিকল্পনা তেমনি আমাদের মানবজাতিকে সৃষ্টির পিছনে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য। ঈশ্বর এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবক্তাদের পাঠিয়েছেন। শেষে নিজ পুত্র যিশুকে তিনি এই পৃথিবীতে পাঠান। যিশু এ জগতে এসেছেন সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। যিশুকে অনুসরণ করলে, তাঁর আদেশ পালন করলে, তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে, আমরা এ জগতে অর্থপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি শুধু তা- নয় আমরা অনন্ত জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারি।

আজকের প্রথম পাঠ প্রজ্ঞাপুস্তকে আমরা শুনেছি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময়। তাই তিনি পাপী-তাপীর প্রতি ধৈর্য ধরেন এবং মন পরিবর্তনের সুযোগ দেন। তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে বিশ্বস্থ থাকলে যেকোন মন্দ শক্তিকে জয় করা সম্ভব

আজকের দ্বিতীয় পাঠে রোমীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র আমাদের বলছে, আমরা মানুষেরা স্বভাবতঃ দুর্বল হলেও খ্রিস্টের আত্মার প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্থতা আমাদেরকে শুক্তশালী করে তোলে। পবিত্র আত্মায় জীবন-যাপন স্বর্গরাজ্যে যাবার চাবিকাঠি।

আজকে মথি লিখিত মঙ্গলসামাচারে আমরা শুনেছি যে, ঈশ্বর এজগতে স্বর্গরাজ্যের বীজ বুনেছেন। এই বীজকে অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষে পরিণত হতে হবে এবং ফুলে ফলে বিকশিত হতে হবে। সমস্ত ঝড়-তুফান তথা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সত্য, ন্যায় ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা মণ্ডলী তথা আমাদের প্রতিজন খ্রিস্টভক্তের নৈতিক দায়িত্ব।

যিশুর বাণী বুঝতে হলে একান্তভাবে যিশুকে সময় দিতে হবে, তার কাছে যেতে হবে। আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর তা করা সম্ভব প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে।

এই পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে- ভাল ও মন্দ। মন্দ লোকদের ঈশ্বর সুযোগ দান করেন যাতে মন পরিবর্তন করেন। পৃথিবীতে সবাই নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। সকল মানুষকে আত্মা-বুদ্ধি-ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে মন্দতা প্রবেশ করে। এজন্য ঈশ্বর সুযোগ দেন যাতে মন পরিবর্তন করে।

আজকের মঙ্গলসমাচারের আলোকে আমরা আমাদের ব্যক্তিজীবনের দিকে তাকাতে পারি। আমার ব্যক্তিজীবনেও গমের গাছ ও শ্যামাঘাস দু'টি দু'ধরনের বিষয়ই রয়েছে- গমের গাছ আমার জীবনে ভাল দিকসমূহ- চারিত্রিক সৌন্দর্য অন্যদিকে শ্যামাঘাস হচ্ছে আমার জীবনে মন্দ দিকসমূহ- যা পাপের দিকে ধাবিত করে, ভাল দিকসমূহকে চাপা দিয়ে যায়- সেগুলো হতে পারে আমার রাগ, অহংকার, স্বার্থপরতা, অগ্রহণীয় মনোভাব প্রভৃতি। ব্যক্তিজীবনে শ্যামাঘাসগুলোকে উচ্ছেদ করতে হবে- শ্যামাঘাসগুলো হতে পারে- আমার অহংবোধ, ক্ষমতার লড়াই, অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সা, আমার মন্দ ব্যবহার। অন্যথায় - এই মন্দ দিকগুলো আমাদের সেই অনন্ত শাস্তির দিকে ধাবিত করতে পারে।

আমরা একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে, দীক্ষস্নানের গুণে আমরা প্রতিজন খ্রিস্টের আত্মাকে লাভ করেছি। খ্রিস্টের আত্মা লাভ করার সাথে সাথে আমরা দায়িত্ব পেয়েছি- নিজের মধ্যে এবং সমাজে বিদ্যমান সকল প্রকার মন্দতাকে জয় করার। প্রশ্ন হতে পারে- আমরা কেমন করে সকল মন্দতাকে জয় করতে পারব? খ্রিস্টের আত্মার শিক্ষানুসারে এবং দিক-নির্দেশনা মোতাবেক চলে মন্দের সাথে, মন্দতার সাথে সংগ্রাম করে সামনে দিকে এগিয়ে চলাই আমাদের প্রতিজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর দায়িত্ব-কর্তব্য।

এই জগতে ও পাপময় সংসারে ঈশ্বরভক্ত মানুষ হিসাবে খ্রিস্টের ন্যায়-নীতি ও শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা কঠিন কাজ, কিন্তু শত পরীক্ষা-প্রলোভনেও যে বিশ্বাসে স্থির থাকে, সে-ই পরিণামে সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভ করে। সে-ই নিজেকে শাশ্বত জীবনরাজ্যের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।।

আমরা প্রচেষ্টা চালালে ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করেন। তাই আসুন আমরা চেষ্টা করি আমাদের জীবন থেকে শ্যামাঘাসের ন্যায় মন্দ দিকগুলো পরিহার করি এবং গমের চারার ন্যায় সুন্দর দিকগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে পারি॥

বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ *(১৭ পৃষ্ঠার পর)*

সামাজিক যোগাযোগ, সমাজ উন্নয়ন, সৃজনশীল শিক্ষাদান অনুষ্ঠান এবং পালকীয় বিভিন্ন কাজে তিনি ছিলেন প্রবর্তক ও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দক্ষ ও সুবিবেচক সুনামধন্য পরিকল্পক হলেও তিনি শান্ত, নম্র ও নির্মোহ জীবন কাটিয়েছেন। তার সকল কিছুতেই আধ্যাত্মিকতার একটি গভীর প্রকাশ ছিল। ফাদার রেমণ্ড প্রচুর ফাণ্ড ও প্রকল্প নিয়ে সফলতার সাথে কাজ করলেও কঠোর ত্যাগের জীবনযাপন করেছেন। তার সহজ-সরল জীবনযাপনেই তার প্রকাশ ঘটতো তার কৃচ্ছসাধন। তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাতেই রেডিও ভেরিতাস এশিয়া (আরভিএ) শর্ট ওয়েভ থেকে অনলাইন পরিষেবাতে পরিবর্তিত হয়েছে।

তিনি দরিদ্রদের ভীষণ ভালবাসতেন এবং তাদের কষ্টটা ভীষণভাবে উপলব্ধি করতেন। তাই দরিদ্রদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আন্দ্রা প্রদেশ সোস্যাল সার্ভিস সোসাইটি (APSS) প্রতিষ্ঠা করেন যারা দরিদ্রদের মানসম্মত জীবনমানের নিশ্চয়তা দান করবে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের যত্ন দানের জন্য 'হোম ফর ডিসএবোল' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কাজে সহায়তা করেন। এই গৃহেই তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করছিলেন। এখানেই তার মৃত্যু ও সমাধি হয়েছে।

কিছুদিন আগেই তিনি তার ৭৫তম জন্মদিন পালন করেছেন। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও কোন কাজ থেকেই তিনি অব্যাহতি নেননি। কোন কাজে কেউ তার সহায়তা চাইলে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন সহায়তা করতে এবং সর্বোত্তম ভাবে সে সেবাকাজ সম্পন্ন করতেন। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন দরদী বন্ধু হিসেবেও তিনি বেশ পরিচিত। বিশেষভাবে যোগাযোগ ও প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সরাসরি সহায়তা করেছেন। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বর্তমান প্রেস গড়ে ওঠতে তার সহায়তা যেমন ছিল তেমনি ভবিষ্যতের খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পুর্ননির্মাণকল্পে পরামর্শ, পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা দিয়েও তিনি সহায়তা করে যাচ্ছিলেন। ফাদার রেমণ্ডের অন্তরে বাংলাদেশের জন্য বিশেষ একটি স্থান ছিল। তাই তিনি বার বার এদেশে এসেছেন এবং মিশেছেন বিভিন্নজনের সাথে। ফাদার রেমণ্ডের মৃত্যুতে এশিয়ার মণ্ডলী হারালো একজন দক্ষ যোগাযোগবিদ ও সুদক্ষ প্রশাসককে আর বাংলাদেশ মণ্ডলী হারালো একজন সুহৃদ বন্ধুকে।

- *তথ্যসূত্র : news.va,* rvanews, ucanews.

যিশুই জীবনের উৎস

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

ইহুদী জাতি আজ অবধি মশীহের আগমনের অপেক্ষাতে আছে। তারা বিশ্বাস করে না যে প্রভু যিশু ইতোমধ্যে এ পার্থিব জগতে এসেছেন এবং জগতকে জয় করেছেন। ঠিক চলতি মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবীর একটা বিরাট গোষ্ঠি প্রভু যিশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে না কিংবা তিনি ঈশ্বর তনয় তাও শুনতে, বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে চায় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, শুনলে যেন তাদের মহা পাপ হবে কিংবা গায়ের পশম খাস পড়বে। শয়তান তো এই রকমটাই চেয়েছিল যেন ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে এক বিরাট ব্যবধান রচিত হয়। শয়তান প্রধান লুসিফার তাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য ধুম্রজাল সৃষ্টি করে তাদেরকে সন্দেহের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছে। আমি যখন থেকে লেখা পাঠাবার তাগিদ অনুভব করতে শুরু করলাম তখন থেকেই ভাবতে লাগলাম, পুত্র যিশুর মধ্য দিয়ে না এসে ঈশ্বর কেন সরাসরি নিজেই এ পার্থিব জগতে নেমে আসলেন না? আর যদি তিনি সরাসরি আসতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষের অবস্থা কি হ'ত? কিংবা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হাল কি হ'ত? কেন একটা মাধ্যম অবলম্বন কিংবা ছায়াবৃত্ত হলেন? সসীম মানুষের ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানে এর উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করা বড় ধৃষ্টতা। তবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি মাত্র। আমরা উপলব্ধি করতে পারি জগৎ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ঈশ্বরের যে প্রতাপ ও মহিমা ছিল তিনি যদি সেই মহিমাতেই প্রকাশিত হ'তেন তবে তাঁর সান্নিধ্যের তেজ বা জ্যোতি আমরা সহ্য করতে পারতাম না। নানান প্রতীক এবং নিদর্শন দ্বারা এই মহান উদ্দেশ্যটি ছায়াবৃত্ত করা হয়েছিল। আমরা জানি ঈশ্বর মোশির নিকট প্রকাশিত হয়েছিলেন একটা জ্বলন্ত ঝোঁপের মাধ্যমে। সামান্য এই ঝোঁপের কোন আকর্ষণ ছিল না তথাপি এই ঝোঁপই ঈশ্বরকে ঘিরে রেখেছিল। করুণাময় ঈশ্বর খুব সামান্য একটা প্রতীক দ্বারা নিজের মহিমা আবৃত করে রেখেছিলেন যেন মোশি এই ঝোঁপের প্রতি দৃষ্টি করেও বাঁচতে পারে। এমনিভাবে ঈশ্বর প্রান্তরে ইস্রায়েল জাতির সাথে দিনে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন। ঠিক একই কারণে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে দীনতার দেহে মানুষরূপে এই জগতে প্রেরণ করলেন। আড়ম্বরপূর্ণভাবে নয়। আর খ্রিস্ট মানুষের সাথে এবং মানুষের মধ্যে বাস করলেন। বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ, বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে। আর আমরা তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করলাম, একমাত্র পুত্র হিসেবে পিতার কাছে থেকে পাওয়া সেই যে মহিমা ঐশ, অনুগ্রহ ও সত্যের সেই যে পূর্ণতা *(যোহন ১:১৪)*।

ঈশ্বর আদমকে বিশেষভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রাণবায়ু প্রদান করেছিলেন এবং তা দ্বারা বুঝিয়েছিলেন যে মানব জীবন অন্যান্য সব ধরনের জীবনের থেকে উঁচু ও ভিন্ন পর্যায়ের এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে ঐশরিক জীবনের একটা অনন্য সম্পর্ক রয়েছে। ঈশ্বর হ'লেন মানব জীবনের চূড়ান্ত উৎস। যিশু জগতের মানুষের স্বভাব ধারণ করলেন এবং আমাদের মত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলেন কিন্তু শতভাগ পবিত্রতায় অবস্থান করলেন। এই জগতে পদার্পণ করে আর কেউ শতভাগ পবিত্র থাকতে পারেনি। এই জায়গাতে যিশু অনন্য এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বক্ষেত্রে অনন্য অনন্ত অসীম। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে তার শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বময় প্রভু। সর্ব বিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হ'লেন কিন্তু কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কেননা তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর। যিশুই ঈশ্বরের 'বাক্য'। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আর যেহেতু 'বাক্য' আমাদের কাছে আছে, বাক্য আমাদের সাথে আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ, দিক নির্দেশনা, আমাদের প্রতি তাঁর প্রেম, করুণা, তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি, তাঁর ইচ্ছা, অনুগ্রহ, পরাক্রম, মহিমা সবই 'বাক্য' আকারে বাইবেলে সন্নিবেশিত সেই হেতু ঈশ্বর এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে কথা বলা অব্যাহত রেখেছেন। ঈশ্বর ইম্মানুয়েল অর্থাৎ 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর'। আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সবসময় আছে। এ সংক্রান্ত অনেক প্রতিজ্ঞা বাইবেলে পাওয়া যায়। পুত্র যিশু ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে এবং পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্ব নিয়েই এ জগতে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্যই কাজ করেছেন। কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছার বাইরে যায়নি। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে প্রকাশ করাই খ্রিস্টের এ জগতে নেমে আসার একটা মস্তবড় কাজ। এটা ছাড়া ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে যে বিরাট শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে কিংবা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা ছিন্ন করে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সুসম্পর্ক তৈরী করেছেন। খ্রিস্টকে এই জগতে প্রেরণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের যে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা ছিল অর্থাৎ পাপী মানুষের পরিত্রাণ সাধন করা তার নিশ্চয়তা সাধিত হয়েছে। আদমের অবাধ্যতার দরুণ আমরা

যে পাপী সাব্যস্ত হয়েছি খ্রিস্ট যিশুর মধ্য দিয়ে সেই দোষ থেকে মুক্ত হয়েছি এবং চতুর শয়তানের কবল থেকে নিস্কৃতি পাবার রাস্তা তৈরী হয়েছে।

এখন মানুষের একটা দায়িত্ব হলো পুত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যোহন ৩:১৬ "ঈশ্বর জগতকে এত ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যারা তাকে বিশ্বাস করে তাদের কারো যেন বিনাশ না হয়, বরং সকলে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন।" সমগ্র বাইবেল তন্ন তন্ন করে পাঠ করলে অনুধাবন করা যাবে যে যিশু খ্রিস্টই বাইবেলের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসাই মুখ্য বিষয়। কেননা আনন্দময় এবং শান্তিময় জীবনের একমাত্র উৎস এবং প্রকৃত ভিত্তি স্বয়ং যিশু খ্রিস্টতে। গুরুত্বপূর্ণ এই বাক্যানুসারে ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। অনন্ত জীবনের ব্যবস্থা করা আমাদের জন্য তাঁর একটা প্রতিজ্ঞা এবং খ্রিস্ট যিশু আমাদের জন্য তাঁর দেওয়া উপহার। এই কথাটি শুধুমাত্র অনন্তকাল যাবৎ চলমান সময়কেই নির্দেশ করে না। এটা দ্বারা জীবনের মূল্যবোধ এবং মানকেও বুঝানো হয়েছে। এটা একটা স্বর্গীয় জীবন যা শয়তানের এবং পাপের সব বন্ধন থেকে মুক্ত।

আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তির উৎস স্থল হলেন প্রভু যিশু। শক্তিশালী ভিত্তি এবং একটি দালানের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে। নচেৎ দালানটি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের আত্মিক ভিত্তি হলেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট। কেননা প্রকৃত নির্মল আনন্দদায়ক জীবন যিশু থেকেই আসে। জগতের ধন-সম্পদ, পদমর্যাদাতে সত্যিকারের আনন্দদায়ক শান্তি থাকতে পারে না। বর্তমান সমাজে অনেক খ্রিস্টান আছেন যাদের অনেক সম্পত্তি কিন্তু তাদের অন্তরে শান্তি নেই। একটা অদৃশ্য যাতনা এবং দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। তারা আত্মিকভাবে দুর্বল, জগতের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে তারা সুখ অন্বেষণ করে। ভোগ-বিলাসের মধ্যে শান্তি পেতে চায়। এইভাবে তারা সর্বক্ষন অবসন্ন, হতাশা, ক্লান্ত এবং দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে। উদ্বেগহীন নির্মল আনন্দপূর্ণ সার্থক জীবনের নাগাল তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আসল সুস্থ উদ্বেগহীন জীবনের উৎস যিশুতে। এই বিশ্বাস খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের মনোজগতের কতটা গভীরে প্রোথিত তা ভেবে দেখতে পারি। খ্রিস্টীয় পবোৎসবগুলোতে ঘর-বাড়ি পরিস্কার করা, বাড়ির মূল ফটকে রং করা, নতুন জামা কাপড় ক্রয় করা হয়। উন্নতমানের ভাল খাবারের জন্য উপকরন কেনা-কাটা করা ইত্যাদিতে। এই বিষয়গুলি আত্মিক কার্য না হলেও খ্রিস্টের প্রতি ভালবাসা, আনুগত্য, কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। জাগতিক জীবন যাপন এবং অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সাথে সাথে শান্তিময় জীবনের উৎস খ্রিস্টকে স্মরণ করা এবং তাঁর সাথে সময় কাটান আমাদের প্রচেষ্টাগুলোকে আরো বেশি অর্থবহ করে তোলে। এই প্রক্রিয়া আমাদের জীবনে পরিতৃপ্তি এবং আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে। খ্রিস্টান সমাজের কিছু বিপথগামী অজ্ঞ মানুষ নানা প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য ভোজন, সেবন ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সুখ খোঁজে। যিশু খ্রিস্টের মধ্যে সত্যিকারের আনন্দ তা যেমন তারা জানে না আবার বোঝেও না তদ্রুপ তাদের বন্ধ ও অন্ধ মনে কেউ প্রবেশ করতে দ্বিধান্বিত। কেননা দুষ্টগণ শোনে না ধর্মের কাহিনী। খ্রিস্টের হাতে যারা নিজেকে সর্মপণ করতে পারেননি তারা শয়তানের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। চতুর শয়তান এই ধরনের মানুষগুলোর চোখ বন্ধ করে রাখেন, যেন তারা সুসমাচারের সত্যগুলি এবং তাঁর মহিমা জানতে ও বুঝতে না পারে। কিন্তু ঈশ্বর চান যেন তাঁর সৃষ্ট সকল মানুষ পরিত্রাণ পায়। আমরা তাঁর ইচ্ছাকে কেন সম্মান করতে পারছি না? কেননা আমাদের সমস্ত চিন্তার মধ্যে জাগতিকতা প্রধান বিষয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ যা ঈশ্বরের তা নয় কিন্তু যা মানুষের তাই দিন রাত চিন্তা করছি। জগৎ আর মানুষ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকার জন্য ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন নি। তাঁর প্রধান প্রত্যাশা হ'ল তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতা নিয়ে ভাবা এবং কাজ করা। আমরা যারা এটা সরাসরি করতে পারছি না, অন্তত পক্ষে যারা করছে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি।

বাইবেলের বাক্যে জ্ঞান এবং ধ্যান ছাড়া আমাদের আাত্মিক জাগরণ নেই। বাক্য পড়তে পড়তে ঈশ্বর অর্থাৎ খ্রিস্টকে জানা এবং উপলব্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এইভাবে এক সময় তাঁর পবিত্র ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হৃদয়াঙ্গম করা শুরু হয়ে যায়। আমাদের আত্মিকভাবে জেগে উঠার মানসিক ইচ্ছাকে ধারণ করে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে শুরু করলেই আত্মিক জাগরন শুরু হয়ে যাবে। তখন নিজে থেকেই যিশুর পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াতে শুরু করতে পারি। যা সত্যিকারের জাগরণ বটে। আমাদের মনে রাখা জরুরী যে বাক্য ছাড়া আত্মাকে এবং আত্মা ছাড়া বাক্যকে কখনই হৃদয়ে নিতে পারবো না। যার আরাধনা করছি তাঁকে না জানতে পারলে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি একেবারে নড়বড়ে হয়ে যায়। সেই সময় নিজেকে খ্রিস্টান বা বিশ্বাসী বলে দাবি করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন এই সুন্দর পৃথিবী এবং কাছের মানুষগুলো পর্যন্ত নিজের কাছে ভীষণ অস্বস্থিকর হয়ে ওঠে। সব পেয়ে এইভাবে নিজেকে হারাতে যাব কেন? আসুন না কয়েকটি বাক্য বাইবেল থেকে পড়ে ভাবতে শুরু করে দিই। *যেমন গীতসংহিতা ১৮:২, ৬২:৬, প্রেরিত ৪:১২, যোহন ১৭:৩* ইত্যাদি। বুদ্ধি ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নয় কিন্তু আত্মিকভাবে জেগে উঠার জন্য হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞান আহরণ শুরু করি।

খ্রিস্ট ব্যতীত পাপে বিকারগ্রস্ত মানুষকে পুনরায় নতুন করে গঠন করতে পারেন এমন আর কেউ নেই, থাকবেও না। যিনি তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে ব্যবস্থার অধীন মানুষদের মুক্ত করেছেন। পরিতাপের বিষয় আজও একদল আছে যারা শুধু ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছে, ছাড়তে চাচ্ছে না, চাইলেও পারছে না। এরাই খ্রিস্টকে চিনতে পারছে না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কিত জ্ঞানালোক যিশু খ্রিস্টের মুখমণ্ডলে প্রদর্শিত হয়েছে। অনাদিকাল হতে প্রভু যিশু পিতার সঙ্গে এক ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের ও তাঁর প্রতাপের প্রতিমূর্তি। এই মহিমা প্রকাশ করবার জন্যই তিনি আমাদের জগতে এসেছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন- "আমিই সেই জীবন খাদ্য এবং আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।" *প্রত্যাদেশ গ্রন্থের ১: ১৬, ১৮ পদে* সাধু যোহন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে দর্শন লাভ করেন, সেটি হ'ল- "তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে শানিত একটি তলোয়ার, যার দুদিকে ধার। তাঁর সারা মুখে যেন পূর্ণ দীপ্তি সূর্যেরই বিভা। তারপর তিনি বললেন ভয় পেও না তুমি। আমিই প্রথম আমিই শেষ। আমি সেই জীবনময়: যে আমি একদিন মৃত ছিলাম দেখো সে আমি আজ জীবিত, চিরকালের মতোই জীবিত।"

আমরা অনন্তকালীন জীবন্ত প্রভুর সন্তান হিসাবে তাঁর সাথে সাথে থাকবো নাকি আত্ম অহংকার আর লোভ-লালসার যন্ত্রণাতে পিষ্ট হতেই থাকবো আর জগতের চাকচিক্যের মধ্যে ডুবে থাকবো? সময় কিন্তু এখনই ভেবে দেখারও সিদ্ধান্ত নেবার॥ ○

শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনাঘাত ও আমাদের করণীয়

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

ভূমিকা: করোনাঘাত মহামারী আকার ধারণ করেছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই। বদলে গেছে মানুষের জীবন যাপন ও চলাচলের রীতি-নীতি ও অভ্যাস। প্রাণহানীর পাশাপাশি মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে আর্থনৈতিক ভাবে। ক্ষতির সম্মুখীন সকল পেশা ও কর্মজীবী মানুষ। প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক উদ্ভাবনের পূর্বে হয়তো ফিরে আসবে না জীবনের স্বাভাবিকতা। অপরাপর সকল শ্রেণি পেশা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মত অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে শিক্ষা আদান-প্রদানে। চরম ক্ষতির শিকার হচ্ছে সারা বিশ্বের মত আমাদেরও প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী-শিক্ষাকর্মী (প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কারিগরি) এবং তাদের পরিবার পরিজন। অপ্রত্যাশিত এই করোনা ভাইরাস অনেক মানুষের প্রাণহানি সহ অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা উপহার দিলেও ভালো কিছুও কম দেয়নি। বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভূত বর্তমান সমস্যাগুলো নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যম, সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে চলছে নানা আলোচনা, সমালোচনা, দ্বন্দ্ব, পরিকল্পনা, প্রস্তাব আদান প্রদান, প্রশ্নোত্তর, সমস্যা সমাধানের নানা বিকল্প সম্ভাবনার প্রস্তাব প্রতিনিয়ত ঘুরছে। তবে সমস্যা যতই ভয়ানক হোন না কেন, ক্ষতির পরিমাণ যতই বেশী হোক না কেন, ক্ষতের পরিমাণ যতই গভীর হোক না কেন, সমস্যা সমাধানের পথ যতই জটিল হোক না কেন, সমাধানের পথ ধরে মানুষ হাঁটবে, এবং অচিরেই আশাব্যঞ্জক এই প্রত্যাশা আমাদের সবারই, সমাধান হবেই। চোখের সামনে ঘূর্ণেয়মান এই বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর সম্মীলিত উপস্থাপন ও আশু সমাধানের সম্ভাব্যতা তুলে ধরাই এই লেখনির ক্ষুদ্র প্রয়াস।

করোনাঘাতে শিক্ষায় নেতিবাচক আলোচনা

সব বন্ধ : ১৭ মার্চ থেকে হঠাৎ করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধের পূর্বে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন সময় দেওয়া হয়নি শিক্ষার্থীদের কোন দিক নির্দেশনা দিয়ে পাঠাতে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সকলেই হয়তো মনে করেছে এখন সব বন্ধ তাই পড়ালেখাও বন্ধ। কিন্তু এই বন্ধ যদি দীর্ঘ হয় তবে শিক্ষার্থীরা কি, কিভাবে, এবং কতটুকু কাজ বাড়িতে বসে করবে তার কোন নির্দেশনা দেওয়ার ও নেওয়ার সুযোগ হয়নি। একটি অনিশ্চয়তা নিয়ে সকলেই সাধারণ ছুটিতে গেছেন।

কিছুদিনের মধ্যেই একটা আত্মোপলব্ধি আসতে শুরু করেছে, যদি দু-তিন দিন সময় পাওয়া বা নেওয়া যেতো তবে কতইনা ভালো হতো।

হারিয়েছে জীবনের শৃংখলা ও গতি: অনিশ্চিত ছুটির মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতার কারণেই শিক্ষার্থী প্রথম দিকে তার শিক্ষা জীবনের দৈনন্দিন অত্যাবশ্যক শৃংখলাগুলো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছাড় দিতে শুরু করেছে, যেহেতু প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় কোন নির্দেশনা দিয়ে ও নিয়ে ছুটি শুরু করা যায়নি। কমতে শুরু করেছে কর্মের ও জীবনের গতি, ভালো না লাগা থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়েছে অযথা সময় নষ্ট করার প্রবণতা, পিতা-মাতা ও গুরুজনের অবাধ্য হবার মত অপ্রত্যাশিত আচরণ, দৃশ্যমান হয়েছে উদ্ভট কিছু আচরণ যা আগে কখনো হয়তো দেখা যায়নি যা পুনরুদ্ধার অনেকটা কঠিন হবে বলেই সামনের দিনের আশংকা।

করোনাবন্দি পাবলিক পরীক্ষা: আভ্যন্তরীণ নিয়মিত পরিক্ষাগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, বন্দি হয়ে পড়েছে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাবলিক পরীক্ষাগুলো। সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরে গেছে অপূরণীয় সেশন জটে। চরম অনিশ্চয়তায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সহ সংশ্লিষ্ট সকলে। বিলম্বিত হবার আশু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পরবর্তি শ্রেণি, পর্যায় ও সেশন শুরুর বিষয়টি। হতাশা-নিরাশা আছড়ে পরেছে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে, পড়ালেখার আগ্রহ, মনোবল, অধ্যবসায় হারিয়ে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো সময়। হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের মন্থর গতিও।

মানসিক বিপর্যয় ও সামাজিকীকরণে বাধা: ঘরবন্দি শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত পরিবেশের কারণে, গণ্ডীবদ্ধ স্থানে অসহনীয় পরিবেশে বসবাস ক'রে, উদ্ভূত ও সঙ্গত হতাশাজনক পরিবেশে, পারিবারিক অসন্তুষ্টি, বিবাদ ও অর্থনৈতিক সংকটাবস্থা দর্শনে নানাভাবে মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। মনোজগতে শিক্ষার্থীর উপর পরছে নেতিবাচক প্রভাব যা তার আবেগে, আচরণে ও কর্মে নেতিবাচকরূপেই বাহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এর পাশাপাশি বন্দি ঘরে ছোট্ট পরিসরে দীর্ঘকাল অবস্থানের কারণে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, নীতি নৈতিকতা, নিয়ম-কানুন, দায়িত্ব-কর্তব্য ও সহভাগিতা-সহযোগিতার চর্চাহীনতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সামাজিকীকরণের মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ: যেহেতু বন্দি জীবনে উপরোক্ত অবস্থাগুলো শিক্ষার্থীদের জীবন বিষিয়ে তুলছে এবং আচরণিক নেতিবাচক প্রবণতাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেহেতু পিতা-মাতা, অভিভাবক বা পারিবারিক অপরাপর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ অনেক সময় তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় হাপিয়ে যাচ্ছেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অভিভাবক শ্রেণির অনিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ায় তাদের উপর নেমে আসছে শাসনের নামে নির্যাতন-নিপীড়ন। অন্যদিকে ঘরবন্দি নিকটাত্মীয় বা অন্য কারো সাথে নানা অপ্রত্যাশিত কিংবা অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরছে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী শিক্ষার্থীরা। অনন্যোপায় হয়ে বা অভাবের তাড়নায় কিংবা পরিবেশের কারণে বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়সী কিশোরীকে দেওয়া হচ্ছে বিয়ে যা জাতি ও সমাজকে আবারো পিছনের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

বখে যাওয়াঃ দেশের সকল জায়গায় করোনার প্রাদুর্ভাব এক রকম নয়, যেখানে বেশি সেখানে হয়তো কোন না কোনভাবে অভিভাবক শ্রেণি বেশিরভাগ সময় সন্তানকে ধরে বেধে ঘরেই রাখছেন এবং মোটামুটি উচ্ছন্নে যাওয়ার হাত থেকে সুরক্ষা করতে পারছেন। কিন্তু যে সকল এলাকায় সমস্যাটা প্রকট নয় সেখানে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই লাগামহীন ঘোড়া! আবার অতি আদুরে সন্তান, বয়সে একটু বড় হয়েছে, শাসন করার মত অভিভাবক হয়তো কাছে থাকেন না এমন শিক্ষার্থীদের অনেকেই নিজ স্বাধীনতা ব্যবহারের কৌশল হিসেবে অভিভাবককে ধমক দিয়ে, নানাভাবে জিম্মি করে, অবাধ্য হয়ে বা কোন খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছে ঘুড়ির খেয়ালখুশিতে। দিনে দিনে পরিবর্তন হচ্ছে তার অভ্যাস, রুচি, আচরণ ও জীবন। এক কথায় বখে যাচ্ছে অনেকেই।

ঝরে পড়ার আশু সম্ভাবনাঃ আজ পর্যন্ত শুধু ঢাকা শহর ছেড়ে নাকি প্রায় পঞ্চাশ হাজার পরিবার সব কিছু নিয়ে গ্রামে চলে গেছে, অচিরেই আরো কত মানুষ শহর ছাড়বে কে জানে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও ইতোমধ্যে চাকুরী হারিয়েছে প্রায় দু'কোটি মানুষ, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উপার্জন ও আর্থিক সক্ষমতা, পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক পরিবার বিভিন্ন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে গ্রামের বাড়ীতে, অনেকে বদলাচ্ছেন পেশা, কবে তারা চাকুরী ফিরে পাবে, কবে তারা আবার আসবে শহরে নিজের স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি ছোট্ট বাসায়? অনেক শিশু কিশোর ও যুবারা পরিবার ও নিজেকে বাঁচাতে নেমে পড়ছে জীবন যুদ্ধে জীবিকার সন্ধানে, তারা কি সহসা ফিরে আসতে পারবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে? প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরেই বেড়ে যাচ্ছে ঝরে পরার চরম হুমকী। ছোটরা কিছুকাল বিরতির পর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলেও তুলনামূলক ভাবে বড়দের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

নেট/প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততাঃ পরিস্থিতি মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের মঙ্গলার্থে সরকারীভাবে সীমিত আকারে টেলিভিশনে আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে (খুব সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে) ভার্চুয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে ইন্টারনেটের সুবিধা সকলের কাছে পৌছেনি আবার যেখানে পৌঁচেছে সেখানে সকলের আর্থিক সামর্থ্য নেই তার প্রয়োজনীয় উপকরণাদির আয়োজনের। সেক্ষেত্রে প্রদেয় ও সম্ভাব্য সুবিধা একটা বড় সংখ্যক শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে ব্যর্থ। একদিকে তারা সঙ্গত কারণে বঞ্চিত অন্যদিকে বঞ্চনার ব্যথায় মর্মাহত ও হতাশায় নিমজ্জিত চলমান সময়ে ঘটে যাওয়া ক্ষতিগুলো অনাগত ভবিষ্যতে সে কিভাবে মোকাবেলা করবে ও পুষিয়ে নিবে সেই ভাবনায়।

নেটাসক্তিঃ আবার বেশ ভালো একটা সংখ্যা যারা ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে, পারিবারিক ও আর্থিক সুবিধার কারণে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করছে। কেউ কেউ উক্ত সুবিধার যথাযথ ব্যবহারে প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হলেও তাদের মধ্যে অনেকে অনলাইন ক্লাশের সুবাদে অভিভাবকের ফেইসবুক ব্যবহার করছে অথবা নিজের আইডি খুলে নিয়েছে। কেউ কেউ অভিভাবককে বোকা বানিয়ে নিজের জন্য ডিভাইস দাবী করে আদায় করে নিয়েছে, আবার অনেকে অভিভাবকের ডিভাইসটি অনলাইন ক্লাশের অজুহাতে দিনের সিংহভাগ সময় নিজের কাছে রেখে যথেচ্ছ ব্যবহার বা অপব্যবহারে রত আছে। এভাবে নানা কারণে নানা অজুহাতে, নানা কৌশলে অনেক শিক্ষার্থী নানা বাজে সাইটে আসক্ত হয়ে পড়ছে, কে, কবে, কিভাবে তাকে আগামী দিনে সেই অবস্থান থেকে ফিরিয়ে বা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে জানি না। আগামী দিনে এটি হতে পারে সকলের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকের মধ্যে বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিঃ শিক্ষা প্রতিটি মানুষের/শিশুর মৌলিক ও মানবাধিকারের বিষয়, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হবার কথা থাকলেও দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুপাতে আধা-সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশী। অন্যদিকে করোনার মহামারীর সময়ে সরকারী ও আধা-সরকারী (আংশিক) শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন পেলেও আধা-সরকারী (অধিকাংশ) ও বেসরকারী শিক্ষকের অবস্থা দুঃখজনক। যেহেতু সকল মানুষের আয় উপার্জন ক্ষতিগ্রস্থ তাই অনেক প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক অভিভাবকদের দ্বারা আইসোলেশনে আছেন, এমনকি কোথাও কোথাও ভেন্টিলেশনে আছেন।

অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বঃ দেশে আধা সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে বিরাজ করছে চরম টেনশন, টানাটানি ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। কারো ধারণা, 'বেতন দিতে হবে না সরকার দিবে', 'ক্লাস না হলে বেতন নিবে কেন বা দিব কেন', 'আপনারা না দিলে শিক্ষকগণ চলবেন কিভাবে', এ ধরণের নানা মন্তব্য, বক্তব্য, আলোচনা ও সমালোচনা চলছে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ভালোভাবে টিকে থাকতে না পারে তবে বর্তমানে এবং আগামী দিনে শিক্ষার্থীরা পড়তে পারে চরম ভোগান্তিতে। এই বিষয়গুলো শিক্ষকের মর্যাদায়ও হানছে লজ্জাজনক আঘাত।

অ-দক্ষতার প্রমোশনের সম্ভাবনাঃ যদি এবছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যায়, 'তবে সিলেবাস কমিয়ে পরিক্ষা নেওয়া', 'না হয় আগামী বছরের দু'তিন মাস এবছরের শিক্ষা বর্ষে নিয়ে সময় বাড়িয়ে নেওয়া', 'আর ফিরে আসা না গেলে সকলকে অটো-প্রমোশন দেওয়া' এধরণের নানা সম্ভাবনার কথা ভাবা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, খবরে ভাসছে। যেটাই করা হোক না কেন, জ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার কথা চিন্তা করলে এই সকল অবস্থায় শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে আগামী বছর পরবর্তী শ্রেণির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীগণ বুঝবে কিভাবে? যারা তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেধা সম্পন্ন তারা এই কঠিন অবস্থা সামাল দিবে কিভাবে? যে সকল বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়টি জড়িত সে ক্ষেত্রে অদক্ষ একটি গ্রুপ সামনে যাবে। সব কিছু মিলিয়ে অ-দক্ষ, অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রমোশন দিয়ে সবাইকে বিপদে ফেলে দেওয়ার একটি সম্ভাবনা খুব আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসবাব পত্র ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহ স্কুল বিক্রি হবেঃ অতি দুঃখজনক যে কোথাও কোথাও বিজ্ঞাপন ঝুলছে 'আসবাবপত্র সহ স্কুল বিক্রি হবে'! আমরা বুঝতে পারি কোন অবস্থায় প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক বা মালিক যা-ই বলি না কেন তারা এই বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। হয়তো কাল দেখবো, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং আসবাব পত্র সহ বিদ্যালয়/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রি হবে। যদি তাই হয়? যদি বিক্রি না হয়, যদি চালানোও সম্ভব না হয় তবে কি হবে? হয়তো বন্ধ হবে! তবে যে শিক্ষার্থীগণ ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোতে আছেন তারা কোথায় যাবে? যারা আজ বেতন দিতে চাচ্ছেন না তারা সন্তান নিয়ে কোথায় যাবেন? আদালতে? সমাধান কবে হবে? আমার এত্তসব কিছু জানা নেই। (চলবে)

আদর্শ শিক্ষক

ডিকন বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস

একি বিয়ের অনুষ্ঠানে এক যুবক তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে দেখতে পেলেন। বহুদিন পর ছোট বেলার শিক্ষককে দেখে যুবক তার কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন, "স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

শিক্ষক বললেন, "না, আমি খুব দুঃখিত, তোমাকে চিনতে পারছি না।"

যুবক তখন বললেন, "স্যার, আমি আপনার ছাত্র। আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা, তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাদের এক সহপাঠীর দামি একটি কলম চুরি হয়েছিল। সেই সহপাঠী কাঁদতে কাঁদতে আপনাকে নালিশ করলো। আর আপনি সব ছাত্রকে চোখ বন্ধ করে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বললেন। তারপর একজন একজন করে চেক করতে শুরু করলেন। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। কারণ কলমটি ছিল আমার পকেটে।

আমি যে কলমটি চুরি করেছি তা আবিষ্কার হওয়ার পর আমি যে লজ্জার মুখোমুখি হব! আমার শিক্ষকরা আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পাবেন। স্কুলে সবাই আমাকে 'চোর' বলে ডাকবে এবং এটি জানার পর আমার মা-বাবার কি প্রতিক্রিয়া হবে-এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে হলো।

একসময় আমার পালা এলো। আমি অনুভব করলাম আমার পকেট থেকে আপনি কলমটি বের করছেন। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আপনি কিছু বলছেন না, বরং আপনি বাকী শিক্ষার্থীদের পকেট অনুসন্ধান করে চলেছেন।

তারপর যখন অনুসন্ধান শেষ হলো, আপনি আমাদের চোখ খুলতে বললেন এবং আমাদের সবাইকে বসতে বললেন। ভয়ে আমি তো বসতেই পারছিলাম না। কারণ মনে হচ্ছিল একটু পরেই আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। না, আপনি তা না করে কলমটি সবাইকে দেখালেন এবং কলমের মালিককে ফেরৎ দিলেন।

কলমটি যে চুরি করেছে তার নাম আপনি আর কখনও কাউকে বলেননি। আপনি আমাকে একটি কথাও বলেননি এবং কখনও কারও কাছেও এ ঘটনার কথা বলেননি।

স্যার, আপনি সেদিন আমার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

এই ঘটনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম জীবনে আর কোনদিন অন্যের জিনিস চুরি করা দূরে থাক; ছুঁয়েও দেখবো না।

স্যার, এখন আমার কথা মনে পড়ছি কি? ঘটনাটা তো আপনার ভোলার কথা নয়?

শিক্ষক জবাব দিলেন, "হ্যাঁ! ঘটনাটা খুব ভালভাবেই মনে আছে আমার। তবে কার পকেটে কলমটি পাওয়া গিয়েছিল তা কখনো জানতে পারিনি। কারণ যখন আমি সবার পকেট অনুসন্ধান করছিলাম তখন আমি ইচ্ছে করেই তোমাদের মত নিজের চোখও বন্ধ করে রেখেছিলাম"।

এটি একটি ছোট গল্প। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পের সঙ্গ অনুসারে "ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল, সহস্র বিস্মৃতিরাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি, তারি দু'চারিটি অশ্রুজল। নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা, নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ। অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়ে হইলো না শেষ"। কিন্তু বাস্তবিক আমার গল্পটা এখানেই শেষ। সে যাই হোক, এটি একটি 'আদর্শ শিক্ষক' এর ছোট একটি ঘটনা বা গল্প। এখন আমরা প্রত্যেকেই যদি আমাদের স্মৃতির পাতা একটু নাড়া-চাড়া করি, তাহলে দেখতে পাবো এমনতর বহু ঘটনা আমাদের স্মৃতিপটে রয়েছে; যা হয়তো কখনো কারো মুখে শুনেছি, নিজ চোখে দেখেছি, কিংবা নিজ জীবনে অভিজ্ঞতা করেছি। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটনাও যে আমাদের স্মৃতিপটে নেই সেটা বলছি না বা অস্বীকার করছি না।

আমরা প্রত্যেকেই হয়তো ছোট বেলায় পড়েছি, কিংবা শুনেছি 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। এ কথা শুনে প্রশ্ন আসে তাহলে শিক্ষক কি? এক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, শিক্ষক হলেন সেই মেরুদণ্ডের 'কারিগর' বা 'নির্মাতা'। যিনি ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, অতি সাবধানে, মনের মাধুরি মিশিয়ে, অতি যত্নে, পরম মমতায় এই মেরুদণ্ড গড়ে তোলেন; যেন জাতি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত শক্তি, সাহস, প্রেরণা, চেতনা, মনোবল লাভ করতে পারে।

একজন শিক্ষক যুগ যুগ ধরে নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে পবিত্র মন নিয়ে ঠিক এই কাজটায় করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা কি তাঁদের এই নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত সেবা কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছি! আজ এটা গোটা জাতির কাছে বিশাল একটা প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা! আমার ব্যক্তিগত আত্ম উপলব্ধিতে কেন যেন মনে হয় আমরা তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছি না বা দিতে পাচ্ছি না। আসলে এটা আমাদের জাতির জন্য চরম একটি ব্যর্থতা। যিনি বা যারা একটা গোটা জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করে গড়ে তুলতে তিলে তিলে নিজেদের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি সত্যিই এটা আমাদের চরম অন্যায্যতা বা অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়!

এটা গেলো একটা দিক। অন্যদিকে, পরিতাপের বিষয় হলো প্রতিদিন খবরের পাতা উল্টালেই দেখতে পায়, শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রী ধর্ষিত, শিক্ষকের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে শিক্ষক যেন হয়ে উঠেছেন ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন; অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, তারা ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা করে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন বা আয় করছেন। ফলশ্রুতিতে তাই বলতে দ্বিধা নেই, যে শিক্ষক ছিলেন 'জাতি গড়ার কারিগর' তিনি হয়ে উঠছেন 'মানুষ ভাঙ্গার যাতাকল'। আসলে একটা সময় শিক্ষক সমাজের প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস, আস্থা, ভক্তি, ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা ছিল, দিন যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই যেন সেগুলো বিপরীতরূপ ধারণ করছে। তাই হতে পারে সাধু যাকোব তাঁর ধর্মপত্রে শিক্ষাগুরুদের প্রতি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন, "শোন, ভাই: তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে যেয়ো না! তোমরা নিশ্চয়ই

জান, আমরা, ধর্মশিক্ষা দিই যারা, অন্যদের তুলনায় আমাদের বিচার কিন্তু আরও কঠোর ভাবেই করা হবে। আমাদের সকলেরই তো প্রায়ই দোষ-ত্রুটি ঘটে" *(যাকোব ৩: ১-২)*।

নটরডেম কলেজের প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি'এর মুখে বহুবার শুনেছি 'কম কথা বেশি কাজ' অর্থাৎ তিনি এ কথা দিয়ে বোঝাতে চাইতেন, মানুষের জ্ঞানগর্ভ বা সুমধুর কথার চেয়ে জীবনাচরণ বা কাজ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার এই মূল্যবান শিক্ষা এজন্য মনে পড়ছে যে, বর্তমান পৃথিবী যেন আজ কথার জোয়ারে ভাসছে। যে যেখানে ও যখন সময় পাচ্ছে দু'চারটি কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। বর্তমান পৃথিবীতে যেন শিক্ষকের কোন অভাব নেই! কিন্তু কথা হলো মানুষকে কি বলছি আর নিজের জীবনে কি কাজ করছি সেটাই আসলে দেখার বিষয়। হতে পারে যিশু খ্রিস্ট এজন্যই শাস্ত্রীদের ও ফরিসিদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, "শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা স্বয়ং মোশীর আসনেই বসে আছেন; কাজেই তারা তোমাদের যা কিছু করতে বলেন, তোমরা তা-ই করো, তাদের কথা মতোই চ'লো; কিন্তু তারা নিজেরা যা করেন, তোমরা তা করতে যেয়ো না, কারণ তারা বলেন এক রকম, করেন আর এক রকম" *(মথি ২৩: ২-৩)*! তাই মানুষকে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ার মাঝেও আমরা যেন কোন ভাবেই ভুলে না যায়, 'শোনার মানুষ হলো সোনার মানুষ'।

আজও মনে পড়ে সেই দিনের কথা যখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তাম। আমার শিক্ষিকা ছিলেন এ্যানজেলিকা দিদিমণি (সরদার)। তিনি বয়স্কা বা বৃদ্ধা মানুষ ছিলেন। কিন্তু পড়াশুনা না করলে, সময় মতো বাড়ির কাজ জমা না দিতে পারলে, কিংবা দুষ্টামি করলে দু'টি চোয়াল বা কান টেনে ধরে এমন মার বা পিটানি দিতেন যে, বোঝাই যেত না যে, তিনি ৭০ বছরের বয়স্কা নারী। আজ আর তিনি বেঁচে নেই। কিন্তু জীবনের এই পর্যায়ে এসে মাঝে মাঝে মনের অজান্তেই গেয়ে ওঠি, পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়, ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়"।

আসলে জীবনের এই পর্যায় পর্যন্ত আসতে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার সান্নিধ্য পেয়েছি বা সান্নিধ্যে গিয়েছি, কিন্তু আজও শিশু কালের এই শিক্ষিকার নাক এবং কান টেনে ধরে পিটানির কথা এখনো মনে পড়ে। অবশ্য তার হাতে বেশি পিটানি খেয়েছি শুধুমাত্র এজন্য যে তার কথা মনে পড়ে তা নয়, বরং আমার জীবনের ভিতকে শক্ত বা মজবুত করে গড়ে দেওয়ার জন্য তার কথা বেশি ক'রে মনে পড়ে।

আমরা বর্তমান কালে অনেক সময় ভুলে যাই বাইবেলের এই মূল্যবান শিক্ষা, "আমার যে-শাখায় ফল ধরে না, তিনি তা কেটে ফেলেন। আর যে-শাখায় ফল ধরে, তিনি তা ছেঁটে দেন, যেন আরও বেশি ফল ধরে" *(যোহন ১৫: ২)"*। আসলে তিনি (এ্যানজেলিকা দিদিমণি) সে সময় এমনভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে শক্ত ভিত না দিলে কিংবা আমার সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, মন্দতা গুলো কেটে বা ছেঁটে না দিতেন তাহলে হয়তো এই পর্যায়ে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা মানুষের জন্য ভাল ফল বয়ে আনতে পারতাম কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সে যাই হোক, বর্তমান কালে দেশে আইন হয়েছে, শিশুদের শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা যাবে না। অবশ্যই এটা ভাল এবং সময় উপযোগী একটা আইন বা সিদ্ধান্ত। তাছাড়া আমি নিজেও কাউকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা পছন্দ করি না। কিন্তু বাংলাদেশে বহু প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্য অস্বীকার করি কেমন করে, 'ডাণ্ডা না খেলে বাঙ্গালী ঠাণ্ডা হয় না' কিংবা 'ডাণ্ডা হাতে না দেখলে বাঙ্গালী ঠাণ্ডা হয় না'। আর এর প্রমাণ অতীত ও বর্তমানে অহরহ দেখা গেছে ও যাচ্ছে এবং আশা করি ভবিষ্যতেও দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে আগের যুগের শিক্ষকদের ডাণ্ডার একটা উপকারিতা কিন্তু আমরা কোন ভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগেও কিন্তু ডাণ্ডার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাচ্ছে।

এটা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, বাংলাদেশে একটা সময় শিক্ষকদের প্রতি মানুষের যথেষ্ট সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। এখন যে নেই সেটা বলছি না। এখনো আছে, তবে কিছুটা কম। আমি নিজে করেছি এবং দেখেছি শিক্ষকদের আসতে দেখলে (ছাত্র) সাইকেল থেকে নেমে যেতে, মুখ থেকে সিগারেট ফেলে দিতে, পায়ে ধরে প্রণাম করতে ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান যুগে এটা দেখা যেন সৌভাগ্যের ব্যাপার। অবশ্য এখনও হাতে গোনা দু'একটি দেখা যায়। অন্যদিকে পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান যুগে অত্যাধুনিকতার নামে শিক্ষক-ছাত্র সিগারেট, মদ খাওয়ার মত ঘটনাও অহরহ ঘটছে। যেটা জাতির জন্য কত বড় হুমকি, সেটা না বললেও বুঝতে পারি। সেক্ষেত্রে অত্যাধুনিকতার নামে এই অপসংস্কৃতি যত তাড়াতাড়ি এ সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে জাতির জন্য তত তাড়াতাড়িই মঙ্গল বয়ে আসবে। তবে এটা ঠিক, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক যত বন্ধুত্বপূর্ণ, পরিপক্ষ ও সুমধুর হবে; উভয়ের জন্যই সেটা কল্যাণকর ও মঙ্গলকর।

তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ, পরিপক্ষ এবং সুমধুর করে তুলি এবং অন্যদিকে একজন শিক্ষক 'আদর্শ শিক্ষক' হয়ে উঠি যেন আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শে গিয়ে এক একজন ছাত্র-ছাত্রী সু-শিক্ষা লাভ করে সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য এক একটি শক্তিশালী মেরুদণ্ড হয়ে উঠে সমাজ, দেশ ও জাতিকে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতে পারে॥ ❑

পথশিশু

পদ্মা সরদার

গরিবের ঘরে জন্মেছি তাই
খিদের বড় জ্বালা
দু'হাত তুলে অশ্রু জলে
ভাসি যে তিন বেলা।

বাবার আদর মায়ের শাসন
পাইনি কোন কালে
রাস্তায় আমার জন্ম তাই
ভাসি চোখের জলে।

রাস্তায় আমার কাটে দিন
রাস্তায় হয় রাত
রাস্তায় বসে ভিক্ষা করি
দেয় যদি কেউ ভাত।

মুখ লুকিয়ে কাঁদি আমি
ঘুমের ঘোরে হাসি
পথ শিশু বলে লোকে
পথকেই ভালবাসি।

ধুলো ঝেড়ে আদর করে
কেউ নেয় না কোলে
চিবুক ধরে কেউ বলে না
কাদিসনে বোকা ছেলে।

সবাই নাকি মানুষ শুনি
নেই তো কারো মন
হাজার লোকের ভিড়ে আজও
খুঁজি আপন জন।

দেখা না হওয়া ভাল ছিল

যোসেফ রায় (পল্টু)

গ্রামের ছেলে মেয়ে, মা বাবা ও বৌদের মাঝে আনন্দের ধারা প্রবাহ মান। কাহার বাবা বিদেশ থেকে অনেক বৎসর পর বাড়িতে আসছে, আবার কাহারও ভাই, কাহারও স্বামি, এদিকে বিমলের মনে দুচিন্তা, কারণ গত বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে সে পাশ করতে পারে নাই, সে জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। তাহার বন্ধুরা এসে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করেও নিতে পারে নাই। জন গমেজ তাহার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে বিমলকে পরীক্ষা দিবার জন্য নোট দিয়ে সাহায্য করছে যাতে সে এবার পাশ করতে পারে। বিমল ভাল গান ও আবৃত্তি করতে পারে, সেই জন্য গ্রামে তার খুব কদর। সে সবাইক জানিয়ে দেয়, বড়দিনের কোন অনুষ্ঠানে থাকতে পারবে না। মায়ের আদেশে পুনরায় পরীক্ষা দিবে। যে ভাবে হউক পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। বিমল তার অযোগ্যতার কথা অকপটে বন্ধুদের কাছে স্বীকার করে। সে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কিন্তু তার পক্ষে সম্মান পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হওয়া সম্ভাব হয় নাই। এর মূল কারণ ছিল গান বাজনা নিয়ে ব্যস্থ থাকা, দরিদ্রতা ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা না করা। বিমল সংসারের বড় ছেলে হওয়ায় সংসারের সমস্ত দায়' দায়িত্ব তাহার উপর বর্তায়। পড়াশুনার পাট চুকিয়ে সে চাকুরির সন্ধানে বাড়ি থেকে ঢাকায় চলে আসে। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করে সে একটি সরকারী অফিসে কেরাণীর চাকুরী পায়। বিমল সর্বদা তাহার জীবনের অযোগ্যতার ব্যাপারে সজাগ ছিল। বিনা ইন্টারভিউতে তাহার এনজিওতে চাকুরী হয় কিন্তু সেখানে যোগদান না করে, সে সরকারী চাকুরীতে কম বেতনে প্রবেশ করে।

তাহার মোরদা কথা - যে কোন সময় এনজিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা লোকবল ছাটাই করতে পারে তখন সে কোথায় যাবে কিন্তু সরকারী চাকুরিতে সারাজীবন কাজ করতে পারবে। তাহার মন সব সময় পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে আবৃত্তি ও গানের উপর আগ্রহ বেশি ছিল। কিন্তু সে দিকে সে আর অগ্রসর হতে পারে নাই। জীবন চলার পথে সহপাঠীদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা ও সাক্ষাৎ হয় এবং কথা বার্তা হয় কেহ কেহ বিদেশী সংস্থায় কর্মরত আছে, কেহ আবার ব্যাবসা বাণিজ্যি নিয়ে আছে। তাহাদের বর্তমান আবস্থার সাথে বিমলের অবস্থা অনেক পার্থক্য। জীবনের গতি যে সমান্তরল নয় তাহা সে ভালভাবে পুর্বেই অনুভব করতে পেরেছে। সেই হারানো দিনের বা অতীত স্মৃতির সাথে বর্তমানের বাস্তবতার সাথে কোন মিল নাই। একদিন বিমল নিউমার্কেট থেকে কাপড় কেনাকাটা করে ফিরছিল

- হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে বিমল দা, বিমল দা, বলে ডাকছিলো, ফিরে দেখে একজন সুন্দরী মহিলা পোশাক আশাকে বুঝা যায় কোন অবস্থা পন্ন ঘরের মহিলা ।

বিমল মহিলাকে বল্লো- মনে হয় আপনি ভুল করে আমায় ডাকছেন।

মহিলা - না আপনি রুদ্রপুর গ্রামের বিমল না? দক্ষিন পাড়া আপনার বাড়ি না? আপনি পাপড়ির বড় ভাই ।

বিমল- তা ঠিক আছে কিন্তু আপনি কে আপনাকে চিনতে পারলাম না ।

মহিলা - হেসে বল্লো, আমি কঁচিদার ছোট বোন আশা ।

বিমলের মনটা নরেচরে উঠলো এবং মুখটা আনন্দে কিছুটা উদভাসিত হয়ে কিছুক্ষণ পর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সবকিছু সামলে নিয়ে বল্লো তুমি আশা।

মহিলা- হ্যাঁ .

বিমল - তোমাকে তো চেনা যায় না । দেখে মনে হয় যেন কোন ধনী ঘরের পরিবার ---।

আশা, বিমলের কথার কোন উত্তর না দিয়ে হো হো করে হেসে দিলো।

অশা বল্লো- এখন আমার হাতে সময় নাই তা'ছাড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাথা বলা যাচ্ছ না, আমার খুব তারা, আপনি সময়করে আমাদের বাড়ি আসবেন, মা ও দাদা খুব খুশি হবেন। এই বলে একটি হাতে কার্ড দিয়ে আশা মানুষের ভিরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিছুক্ষনের জন্য বিমল আশার গন্তব্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো হঠাৎ একটি গাড়ীর হর্ণে তাহার সম্মতি ফিরে এলো। ভাবছিল হেটে হেটে বাসায় যাবে কিন্তু ফার্মগেট যাবো বলে একটি রিক্সায় উঠে পরে, সে হারানো দিনের স্মৃতির পাতাগুলো রোমান্থ করতে আরম্ভ করলো। প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আশা বিমলের সাথে মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেছে। বিমল মেট্রিক পরীক্ষায় ফেল করায় পুনরায় পরীক্ষা দেয়। আশা পরীক্ষায় পাশ করে ওর বড় ভাইয়ের বাসায় ঢাকা চলে আসে। ওর বড় ভাই কচি পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলো তা'ছাড়া আশাদের বাড়ির অবস্থা অনেক ভালো। ওরা দুই ভাই এক বোন। আশার বাবা নাই। আশার বড় ভাই ঢাকায় একটি ফার্মে বড় চাকুরী করায় তাহাদের ভাইবোনেরা কখনো অভাব, কষ্ট অনুভব করে নাই। একবার স্কুলের অনুষ্ঠানে গানের প্রতিযোগিতায় বিমল প্রথম হয়েছিল সেই দিন আশা বিমলকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলো

- বিমলদা, তুমি এত ভালো গান করতে পার, আমি ভাবতে পারিনি। সে থেকে বিমলের ও আশার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সর্ম্পকে হয়। বিমলের একটি ছোট বোন ছিল, তার নাম ছিল পাপড়ি সে খুবেই সুন্দরী ছিল এবং সেও ভাল গান গাইতে পারতো, পাপড়ির ও বিমলের গানের সুনাম গ্রামের সবাই করতো। মাঝে মাঝে আশা গান শুনার জন্য বিমলদের বাড়িতে আসতো। বিমলদের উঠানে একটি বড়ই গাছ ছিলো, আশা বড়ই খুব পছন্দ করতো। বিমল একদিন ঢিল ছুরে বড়ই পাড়তে গিয়ে সেই ঢিল আশার কপালে লাগে কাপাল কেটে যায় ও রক্ত বাহির হয়, বিমল ভয়ে ধরধরিয়ে কাঁপতে থাকে।

- আশা, তা'কে ভয় না পাবার জন্য বার বার বলতে থাকে,

বিমল যত্ন সহকারে সেখানে ঔষধ লাগিয়ে দেয়।

আশা- বিমল দা, তুমি ইচ্ছা করে করো নাই, তুমি ভয় পেয়ো না বাসায় বলবো আমি পরে গিয়েছি । তখন বিমল আশার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আশা তা'তে লজ্জা পায় ও দৌড় দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

সেই কাটা দাগ একদিন স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আশার কপালে চিরদিনের জন্য রয়ে যায়। সে থেকে বিমল নিজের অজান্তে আশাকে মন দিয়ে বসে কিন্তু কখনো বিমল মুখ ফুটে আশাকে এ'কথা বলতে পারে নাই। একবার বিমলের খুব অসুখ হয়, সে খবর আশা একদিন জানতে পারে বিমলের বোন পাপড়ির কাছে। সে মাঝে মাঝে পাপড়ির কাছ থেকে বিমলের খোজ খবর রাখতো। অনেক দিন পর বিমলে সাথে চলার পথে আশার দেখা হয়।

- বিমল প্রথমে আশাকে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো।

আশা - ভাল আছি কিন্তু তুমি এখন সুস্থ

বিমল - হ্যাঁ, একদিনতো দেখতে গেলেনা।

আশা- যেতাম, যাওয়ার বড় ইচ্ছা ছিলো তোমায় দেখার কিন্তু পারি নি, কে' কি ভাবে তার কারণে, পাপড়ির কাছ থেকে তোমার খোজ খবর প্রায়ই নিয়েছি।

আশা- কি' ভাবছো আমার সম্পর্কে।

বিমল - না, কি আর ভাববো । সহপাঠি সে হেতু খোজ নিয়েছো।

হঠাৎ রিস্কাওয়ালা জিজ্ঞাস করলো ফার্মগেট কোথায় নামবেন বিমলের চিন্তার তন্দ্রা ভেংগে গেলো।

- বিমল - এখানে নামবো, রিক্সার ভাড়া দিয়ে কিছু পথ হেটে বাসায় ঢুকলো। টেবিলে রাখা একগ্লাস ঠান্ডা পানি খেয়ে জামা কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লো। আশা যে ঠিকানা দিয়েছে তা, তো দেখা হয়নি। পুনরায় বিছানা থেকে উঠে বিমল পকেট থেকে কাগজটা খুলে দেখল আশাদের বাসা ফার্মগেটের

রাজাবাজার কিন্তু এত কাছে থাকতেও আজ পনের বছর পরে দেখা। ভাবতে কেমন যেন খারাপ লাগছে বিমল ভাবলো, হয়তো আশার জামাই কোন বড় চাকুরী করে সেই হেতু আশাকে ঘরকন্না করতে হয়, নানাবিধো চিন্তা করে বিমল ঘুমিয়ে পরে। অফিসের কাজের চাপে বিমল আশাদের বাড়িতে যেতে সময় পায় না। ছুটির দিন আশাদের বাড়ি যাবার মন স্থির করে। শুক্রবার আশার দেয়া নম্বার অনুযায়ী একটি দোতালা বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো আর বিমল ভাবতে লাগলো কত এই পথ দিয়ে হেটেছি কিন্তু কোন সময় আশার দেখা মিলেনি। বিমল ভাবলো আশার জামাইকে কোন দিন দেখি নাই যা' হউক এবার দেখা যাবে হয়ত আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। কলিং বেল টিপ দিল কিছুক্ষণ পর দরজা খুললো এবং বিমল দেখলো একজন পুরুষ তাহার সামনে দাঁড়ানো সে জিজ্ঞাস করলো কাকে চাই?

-বিমল বললো- এখানে আশা থাকে,

-হ্যাঁ আমার ছোট বোন আপনি কে? অমি, বিমল,

তুমি, বিমল।

- তাই, তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে,

- আমি আশার বড় ভাই, কচি দা,

- কচি - আরে বিমল ঘরে আয়, কচি ঘরের ভিতরে বিমলকে বসতে দিয়ে

ঘরের ভিতরে গিয়ে বৌকে ডেকে বল্লো,

- কচিদা, দেখে যাও কে এসেছে, আমাদের টমাসদার ছেলে, বিমল।

এর মধ্যে কচির মা ঘরে ডুকে বলেলা-

- কচির মা, তুমি দক্ষিন পাড়ার টমাসের ছেলে, তোমাকে কত না ছোট দেখেছি, তুমি কোথায় থাক, তোর বাবা মা কেমন আছে, বিয়ে করেছো তোমার বৌ কেমন কচির মা একসাথে অনেক কথা জিজ্ঞাস করলো।

- বিমল স্থির হয়ে বসে বিস্তারিত খুলে বল্লো এর মধ্যে কচির বৌ নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

কচির বৌ বিমলকে দেখে চমকিয়ে গেলো, নিজেকে সমলিয়ে নিয়ে বল্লো,

- কচির বৌ, বিমল দা কেমন আছেন,

- বিমল ভালো, আপনি যে কচিদার বৌ ভাবতে পারছি না,

- কচি, তুমি ওকে চেনো,

- কচির বৌ, চিনি মানে, ভালো ভাবে চিনি, আমার বড় বোন কল্যানি যে সরকারি অফিসে চাকুরী করে, সেই অফিসে বিমল চাকুরী করে।

- কচি - হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে' তো চিনবেই।

- বিমল - হ্যাঁ একই অফিসে চাকুরী করি।

- কচি, তা হলেতো ভাল হলো, এর মধ্যে দরজায় কলিং বেলের শব্দ কচিদার বৌ, দরজা খুলে দিলো

- আশা ঘড়ে ঢুকলো, পরা ছিল পাতলা সিল্ক শাড়ি সবুজ পার লাল বেলাউজ খুবই মানিছে।

কচির মা বললো এত দেরী কেন, আশা দেরী হবে না আজ যে আমাদের বোর্ডের মিটিং ছিল।

- আশা বিমলের দিকে ফিরে বললো, বিমলদা কেমন আছেন, বাড়ি চিনে আসতে পারলেন তা'হলে।

- বিমল, একটু লজ্জা পেল আশার কথায়,

- বিমল, আরো আগে তোমাদের বাসায় আসা উচিৎ ছিল কিন্তু বাসার নম্বর এবং এখানে থাকো তাহা না 'জানার কারনে আসতে পরিনি।

- আশা- দাদা, বৌদির সাথে কথাবার্তা হয়েছে?

- কচির মা হ্যাঁ ' বিমলে দিকে চেয়ে . বৌমাকে নিয়ে আশা উচিৎ ছিল।

- বিমল- মাসিমা আমি এখনো বিয়ে করেনি, তাছাড়া ছোট বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারিনি.

- কচি, তোমার বোনের নাম পাপড়ি না,

-হ্যাঁ কিন্তু এত সুন্দর মেয়ে বিয়ে দিতে পারনি,

- বিমল বিয়ে দিতে গিয়ে একটি কঠিন সমস্যা সৃষ্টি হয়

- কচি, কি সমস্যা,

- বিমল -বিয়ের দিনে বর পক্ষের দাবী মিটাতে পারিনি বলে. বরপক্ষ বিয়ের আসর থেকে চলে যায়। সে থেকে ভাল কোন সমন্ধো আসছে না, আসলেও পাপড়ি বেকে বসে।

- কচি পুনরায় বলে, পাপড়ি কি করে,

- একটি বিদেশী স্কুলে টিচারি করে এবং সেখানে থাকে। ওকে বিয়ের কাথা বললে ও'বলে জীবনে সে, বিয়ে করবে না।

- আশা, পাপড়ি এত সাহসী ও জেদী মেয়ে হয়েছে, ওর প্রশংসা না করে পারছিনা।

- কচির মা, আমাদের আশাও তোমার বোনের মত সেও বিয়ে করবে না, ওকে নিয়ে আমার ভাবনা। --বিমল, একথা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে আশার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, মনের মাঝে আনন্দ অনুভব হলো।

- বিমল সবার কাছ থেকে বিদায় নিবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে পরলো

সবাই তাকে পুণরায় আসার জন্য অনুরোধ করলো,

- বিমল আবার "আসবে বলে বিদয় নিল, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনের মাঝে অনেক চিন্তা তোলপার করতে থাকলো। মাস খানে পর বিমল একদিন আশার অফিসে গেল কিন্তু সেখানে জানতে পেল আশা গত দুইদিন আগে আমরিকায় এক বৎসরের ট্রেনিং চলে গেছে। বিমলের মনটা কিছুক্ষণের জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। আমার জীবনটা আশা হয়েই থাকবে, তাকে আর কাছে পাওয়া যাবে না। আশার অফিস হতে বাহির হয়ে রমনা পার্কের বটবৃক্ষের নীচে বসে নীল আকাশ দেখতে লাগলো মেঘের ভেলায় আনাগোনা অশান্ত ঢেউয়ের তরঙ্গে হৃদয়টা ভরাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কখন সন্ধ্যা নেমেছে তাহা বিমলের খেয়াল ছিল না। মানুষের চলাচল কমে গেছে। বিমল আস্তে আস্তে বির বির করতে করতে বলছিল আশা সত্যিই তুমি সোনার হরিণ। কতদিন পর দেখা, আবার হারিয়ে যাওয়া যেন ছায়াছবির মত মনের পাতায় আসা যাওয়া। স্নিগ্ধ আলো আকাশের উড়ান্ত মেঘ ঢেকে দেয় তেমনি আশা বিমলের জীবনে মেঘে ঢাকা তারার মত বহু দুরে টিপ টিপ করে জ্বলছে। আজ শুধু অনুভব করা যায় হৃদয় দিয়ে কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। তাই মন দিয়ে ভেবে ভেবে হৃদয় কখনো ভরাক্রান্ত হয়, কখনো হারানো বহু মূল্যবান স্মৃতি তন্ময় হয়ে ভাবতে বেশ ভালই লাগে, জীবন প্রবাহ নদীর স্রোতের মত চলতে থাকে, একদিন সাগরের সাথে হারিয়ে যাবে কোন স্মৃতির চিহ্ন থাকবেনা। এর মধ্যে কয়েক বৎসর কেটে যায়। হঠাৎ একদিন বিমলকে কচিদার বৌ তাদের বাসায় জুন মাসের দশ তারিখে আসার জন্য দাওয়াত দিলো কিন্তু কিসের জন্য তা সে খুলে কিছুই বলেন নাই, বিমল সে মোতাবেক তাদের বাসায় যায়। বিমল দেখে কচিদার বাড়ির ছাদে ছোট ঘাটো পাটির ব্যবস্থা। সবাই চেয়ার নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে বসে আছে, কচি'দা বিমলকে দেখে একগাল হেসে বলে বিমল আশা এসেছে তাই আমি তারাহুরা করে একটি ঘরোয়া পার্টির ব্যবস্থা করেছি। বিমলের মনে আনন্দের ঢেউ অনুভব হতে লাগলো, মুখে হাসির ভাব পরিস্ফুটি হলো। কিছুক্ষণ পরে আশা সুন্দর সাজে এক ভদ্রলোকে হাত ধরে সকলে সামনে উপস্থিত হলো। কচি'দা সবাইক উদ্দেশ্য করে বল্লো, আমার ছোট বোন ও তার স্বামী আমরিকা থেকে আসায় তারাহুরা করে ছোট পরিসরে পরিচয় জন্য একটি পার্টির ব্যবস্থা করেছি, কারণ তারা আগামী সপ্তায় চলে যাবে। কিছুক্ষণ পরে আশা নিজেই তাহার স্বামীর সাথে পরিচয় করে দিলো। বিমল অনেক কষ্টে আশার ও তার স্বামির সাথে হেসে হেসে কথা বলেন। বিমলের মুখ ক্রমেই মলিন হয়ে গেলো। বার বার মনে মাঝে ধ্বনিত হলো আশার সাথে দেখে না হওয়া ভাল ছিল॥ ❑

শাস্তি

খোকন কোড়ায়া

যাকোব স্যারের নৌকায় আমাদের স্কুলে পাঠিয়ে আমাদের বাবা-মারা নিশ্চিন্ত থাকতেন। কারণ তারা জানতেন তাদের ছেলেরা নিরাপদে স্কুলে পৌঁছবে এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবে। পথে কোন বিপদ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কোন বাজে আড্ডা, ধূমপান করা বা স্কুল ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগই তারা পাবে না। তবে সমস্যা হত আমাদের। প্রাণ খুলে আড্ডা দেয়া কিংবা দুষ্টামি-ফাত্‌রামির সুযোগ নেই, দু'একটান সিগারেট ফুঁকবো সে উপায়ও নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!

আমার বাবা দিল্লীর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাড়ি চলে এসেছেন পাঁচ বছর আগে। গত বছর তিনি বাড়িতে মিস্ত্রী ডেকে সুন্দরী কাঠের একটি কোষা নৌকা তৈরী করেছেন। নৌকাটি এগার হাত লম্বা। বাবা এখন বাড়িতে নেই। ময়মনসিংহ শহরে আমার দাদা অর্থাৎ তার মেঝো ছেলের কাছে গেছেন, সেখানে তিন চার মাস থাকবেন। নৌকাটি বাবার খুব প্রিয়। ময়মনসিংহ যাওয়ার আগে মাকে এবং আমাকে বলে গেছেন তার নৌকার যত্ন আত্তি যেন ঠিক মত হয় এবং কোন ক্ষতি যেন না হয়। ময়মনসিংহ গিয়েও মাকে চিঠিতে ঐ একই কথা লিখেছেন। তাই প্রয়োজনে বাবার নৌকা নিয়ে আমি বের হই বটে তবে খুব সাবধানে চালাই। মাকে যখন বললাম, বাবার নৌকা নিয়ে আমি স্কুলে যেতে চাই, মা কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন আমি যাকোব স্যার এবং ঐ নৌকায় অন্যান্য যারা যায় তাদের নামে অনেক মিথ্যা বদনাম করলাম এবং তারা যে বিভিন্নভাবে আমাকে নিগৃহীত করে সেটাও শৈল্পীকভাবে ব্যাখ্যা করলাম। তবুও মা রাজী হলেন না। আমিও নাছোড়বান্দা, প্রতিদিনই একই কথা বলতে লাগলাম। আর আমাদের নৌকায় অন্য যারা যেতে আগ্রহী তারাও এসে তাদের মাসীমা/পিসিমাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করতে লাগলো। অবশেষে মার মন গললো, আদরের ছেলেতো!

প্রথম দিন আমাদের নৌকায় স্কুলে গেলাম পাঁচ জন। আবেল, ডমিনিক, যোসেফ, ক্লাইভ ও আমি। শুরুতেই শুরু হয়ে গেলো দুষ্টামি। একজন বললো- আমাদের সবার নাম পরিবর্তন করবো। সবাই একমত। একজন প্রস্তাব করলো- নাম হবে বান্দুরা বাজারের সহদেবের দোকানের মিষ্টির নামে। পাঁচজনের নাম হয়ে গেলো যথাক্রমে - লালমোহন, কালোজাম, পান্তুয়া, বালুশা ও রসগোল্লা। প্রথম কয়েকদিন ভালই চললো, সময়মত স্কুলে যাই, সময়মত ফিরে আসি। কয়েকদিন পর দেখা গেলো ফেরার পথে দেরী হয়ে যায়। কারণ গল্প আর আড্ডায়

এতই মেতে থাকি যে কেউই ঠিকমত বৈঠা বাই না। এরপর মাঝে মাঝে স্কুলে পৌঁছতে দেরী হতে লাগলো। তারপর শুরু হল অনুপস্থিতি। একদিন কালোজাম স্কুলে যায়তো লালমোহন যায় না, আরেক দিন লালমোহন যায়তো বালুশা যায় না। এভাবে দেখা গেলো প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ অনুপস্থিত থাকে। শুধু অনুপস্থিত থাকতে পারেনা রসগোল্লা কারণ নৌকাটা তারই। একদিন দেখা গেলো স্কুলে যাচ্ছে শুধু দুইজন, রসগোল্লা আর লালমোহন।

পাঁচজন নৌকা বাইলে নৌকা যে গতিতে চলে দু'জন বাইলে কি সে গতিতে চলবে? কখনো না। শৈল্যার বটগাছের কাছাকাছি গিয়ে লালমোহন অর্থাৎ আবেল তার বাবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা 'সিকো-ফাইভ' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, স্কুল শুরু হতে আর মাত্র পনের মিনিট বাকী আছে। তার অর্থ নিশ্চিত লেট। এই বটগাছ নিয়ে অনেক গল্প আছে। এই বটগাছে নাকি ভূতের আখড়া। শুধু ভূত নয়, জ্বীন পরীরাও নাকি থাকে এই বটগাছে। শোনা যায় ভর দুপুরে বা ঘোর সন্ধ্যায় এই বট গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই ভূতের কিম্ভূত কিমাকার অবয়ব দেখেছে, জ্বিনের হাসি শুনেছে, পরীদের নাচের শব্দ পেয়েছে। কথিত আছে কেউ ভূতের বিরাগভাজন হলে ভূত তাকে ধরে এনে এই বটগাছের উঁচু ডালে সারারাত বসিয়ে রাখতো। ভর দুপুরে এই বটগাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক যুবতী নারীর উপর জ্বীনের আছড় পড়েছে। অনেক সুদর্শন যুবককে পরীরা তাদের বাড়ি থেকে ধরে এনে এই বটগাছের ডালে বসিয়ে তার সঙ্গে সারারাত রঙ্গলীলা করে। এ সবই শোনা কথা। তবে যা চাক্ষুষ প্রমানীত তা হল, এই বটগাছটা চোর ডাকাতদের আড্ডাখানা। নিরিবিলি সময়ে এই বটগাছের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই তাদের টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী খুইয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় বান্দুরার হাট থেকে ফেরার সময় হাটুরেদের টাকা পয়সাসহ সওদাপাতিও কেড়ে নিয়েছে এই পেশাদারী ডাকাতরা। গরুর বেপারীরা হারিয়েছেন তাদের লাভ-পুঁজি দু'টোই।

বটগাছ ভূত থাক আর না থাক একটা কিছু আছে। কারণ বটগাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ই আবেল বললো- আজকে স্কুলে না গেলে কেমন হয়? আমি (রসগোল্লা) বললাম- স্কুলে যাবোনা তো কি করবো!

আবেল একটু চিন্তা করে বললো - চল জয়পাড়া যাই সিনেমা দেখতে। দোহার উপজেলার জয়পাড়া এলাকাটি অনেক আগে থেকেই অনেক উন্নত। আজ থেকে প্রায় পাঁচচল্লিশ বছর আগেও সেখানে সিনেমা হল ছিলো, ব্যাংক ছিলো। আমাদের তুইতাল থেকে জয়পাড়ার দূরত্ব সাত কিলোমিটার আর বান্দুরা থেকে চার কিলোমিটার। বললাম-কেউ যদি জানতে পারে?

- কেউ জানতে পারবে না।

- নৌকা কি করবো? স্কুলের ঘাটে রাখতে গেলেতো ধরা খেয়ে যেতে পারি।

- নৌকা বাজারের ঘাটে রেখে যাবো।

- সিনেমার টিকিটের টাকা পাবো কোত্থেকে? আমার কাছে মাত্র আট আনা আছে।

- আমার কাছে দেড় টাকা আছে হয়ে যাবে।

বান্দুরা বাজারে গিয়ে একটি বড় ধানের নৌকার সঙ্গে শিকল দিয়ে আমাদের নৌকাটা তালাবদ্ধ করলাম। তার আগে নৌকার লোকদের জিজ্ঞেস করেছি তারা আজকের দিনটা এই ঘাটে আছে কি না, তারা বলেছে আরো এক সপ্তা আছে তারা। স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এত দূরের রাস্তায় যাওয়া কষ্টকর তাছাড়া স্কুল পালিয়েছি এটা বুঝে ফেলতে পারে কেউ কেউ। তাই প্রচণ্ড একটা মিথ্যা কথা বলে স্কুল ব্যাগটা পরিচিত একটা দোকানে রেখে সড়ক দিয়ে ছুটতে লাগলাম জয়পাড়ার উদ্দেশ্যে।

সবচেয়ে কম দামের টিকিট কাটলাম বারো আনা করে দেড় টাকায় দু'টি। টর্চ লাইট দিয়ে হলের ভিতরে ঢুকিয়ে লোকটি বললো, ঐ চাটাইয়ের উপর বসে পড় ভাতিজারা, সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চাটাইয়ের উপর বসেও রুপালী পর্দার দিকে তাকিয়ে মনে হল, জীবন আজ ধন্য হল। সিনেমার নাম জলছবি। নায়ক ফারুকের প্রথম সিনেমা। নায়িকার নাম কবরী। চিনতাম না কাউকেই, বাইরের পোস্টার দেখে জেনেছি। আড়াই ঘন্টা পর ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে সিনেমা হল থেকে বের হলাম। তারপর খাবারের দোকানে ঢুকে বিশাল বড় আকারের পাতলা রুটি খেলাম রসগোল্লার সিরা দিয়ে। আবার ছুটলাম বান্দুরার উদ্দেশে।

স্কুল ছুটি হবার সময় হয়ে গেছে প্রায়। বাজার থেকে ব্যাগ নিয়ে নৌকার কাছে গেলাম। বড় নৌকার উপরে উঠে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো-আমাদের নৌকাটা নেই, শিকল ডুবে আছে পানিতে। আবেল বললো - মনে হয় ডুবে গেছে। শিকল ধরে টানতে লাগলো আবেল। শিকলের শেষ প্রান্তও উঠে এলো ওর হাতে, নৌকার কোন চিহ্ন নেই। টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো আমার চোখ দিয়ে-কি হবে এখন! বাবার এত সাধের নৌকা! মাকে কি বলবো? মা-ই বা বাবাকে কি কৈফিয়ত দেবে? আবেল ছলোছলো চোখে বড় নৌকার লোকদের জিজ্ঞেস করলো আমাদের নৌকার বিষয়ে তারা কিছু জানে কিনা। একজন বললো, তারা ব্যস্ত ছিলো খেয়াল করেনি। আরেকজন বললো, হয় গুঢ়া কেটে কেউ নৌকা চুরি করে নিয়ে গেছে, নয় তোমরা ঠিকমত তালা লাগাওনি, নৌকা ভেসে গেছে ভাটির দিকে।

আমাদের কাছে আর কোন টাকা পয়সা ছিলো না। আবেল বাকীতে একটা নৌকা ভাড়া করলো। সেই নৌকা নিয়ে আমরা বাগমারা পর্যন্ত গেলাম আমাদের নৌকা খুঁজতে কিন্তু কোন হদিস পেলাম না। রাত নয়টার দিকে বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী প্রায় আট/দশজন মানুষ আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। এত দেরী হল কেন, কোথায় গিয়েছিলি, তোর মা চিন্তায় অস্থির, কোন বিপদ হয়নিতো? আমি থর থর করে কাঁপতে ছিলাম, কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা সারাদিনের ধকলের কারণে। একজন বললো-ওকে আগে একটু বসতে দে, তারপর শোনা যাবে। একজন আমার হাত থেকে স্কুলব্যাগটা নিয়ে ঘরে রাখলো, আর একজন একটা মোড়া এগিয়ে দিলো বসার জন্য। মাকে দেখলাম ঘরের দরজার কাছে মূর্তির মত বসে আছে, যেন অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে। আমাদের পাশের বাড়ির দাদা বললো - এবার বল কি হয়েছিলো? ফেরার পথে যে গল্পটা তৈরী করেছি কাঁদতে কাঁদতে সেটাই বললাম-আমাদের নৌকা ডুবে গেছে। দাদা জিজ্ঞেস করলো- কোথায়? বললাম-বান্দুরা লঞ্চ ঘাটের কাছে।

- তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

- ঐখানেই। চেষ্টা করতেছিলাম নৌকা উঠানোর জন্য।

- আমরা তোদের খুঁজতে গিয়েছিলাম, আধাঘন্টা আগে ফিরেছি। লঞ্চঘাট কেন, সারা বান্দুরা খুঁজেওতো কোথাও পেলাম না তোদের। মিথ্যে বলিস না, সত্য ঘটনা বল।

আমি হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আসল ঘটনা বলে দিলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। মা ঘর থেকে রুটি বানানোর একটা বেলন এনে আমাকে বেধরক পেটাতে লাগলেন। তারপর নিজেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম - হে ঈশ্বর, স্কুল ফাঁকি দেয়ার শাস্তিটা একটু বেশি হয়ে গেলো না! ❑

আলোচিত সংবাদ

আগামী ৬ মাসের মধ্যে করোনার ভ্যাকসিন বাংলাদেশে আনবে গ্লোব বায়োটেক

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় প্রতিদিনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন হাজারো মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে অদৃশ্য এই ভাইরাস মোকাবেলায় বিশ্বের অনেক দেশের বিজ্ঞানীরাই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। তবে এখনও কেউ পুরোপুরি সফলতার মুখ দেখেননি। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড'। বাংলাদেশে গ্লোব বায়োটিক গত ৮ মার্চ থেকে এই টিকা আবিষ্কারে কাজ শুরু করে। সব পর্যায় যথাযথভাবে পেরোতে পারলে আগামী ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে টিকাটি বাজারে আনা সম্ভব হবে। গত ২ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন আশা প্রকাশ করে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড। এই টিকা আবিষ্কারে সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. কাকন নাগ এবং চিফ অপারেটিং অফিসার ড. নাজনীন সুলতানা।

করোনা : ঈদের আগেই চালু হচ্ছে গণস্বাস্থ্যের আইসিইউ ইউনিট

বিশ্বমানের আইসিইউ ইউনিট করছে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল। ৪১ শয্যা বিশিষ্ট এই আইসিইউ ইউনিটের মধ্যে নীচতলায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে করোনা রোগীদের জন্য ১৫ শয্যার একটি ইউনিট করা হচ্ছে। হাসপাতালটির দক্ষিণ পার্শ্বে এই করোনা আইসিইউ ইউনিট তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। আসছে কোরবানীর ঈদের আগেই এই করোনা আইসিইউ ইউনিটের উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মিডিয়া উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

নিয়ন্ত্রণে ডেঙ্গু, ডিএনসিসির নানা উদ্যোগে 'সফলতা'

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। গত বছর রাজধানীতে ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকলেও এ বছর পরিস্থিতি ভিন্ন। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকলেও রাজধানীতে কমেছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। গত বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এবার নানা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, যার সুফলও আসতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা। চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কম। বছরের ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও ডেঙ্গুতে কারও মৃত্যুর তথ্য সরকারের নথিভুক্ত হয়নি। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ঢাকা উত্তরের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, মশক নিধন কার্যক্রমে গত বছরের অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাচ্ছেন তিনি। মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করতে তিনি ১২ জন কীটতত্ত্ববিদের একটি দল করেছেন। সেই সঙ্গে মশা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছেন। সারাবছরই মশক নিধন কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা রেখে তাতে স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগের কথা জানিয়ে আতিকুল ইসলাম বলেন, আমরা মশককর্মীদের হাজিরা, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেব স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে। তারা মশককর্মীদের কার্যক্রম দেখে আমাদের জানাবেন। এতে কাজটি ঠিকমত হচ্ছে কি না নিশ্চিত হওয়া যাবে। - *উৎস: ইত্তেফাক ও জনকণ্ঠ*

নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা বল

নিজেকে প্রকাশ কর। তোমার কাজকর্ম যেন কথা বলে। নিজেকে গুপ্ত ধনের মত লুকিয়ে রেখ না। সহভাগিতা কর।

প্রতিদিন নতুন কিছু শেখ। যা তোমার জানা আছে তা অনুশীলন কর। নিজেকে হাতে-গোনা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখো না। তৎপর হও।

বেছে নাও, মোকাবেলা কর, কাজে নেমে পড়, যথাযথভাবে উপলব্ধি কর।

বিষয়গুলি নিজের উপযোগী করে নাও। বাস্তবায়নের জন্য তা বেছে নাও। নিজে দায়িত্ব পালন কর।

যদি তুমি জনশূণ্য কোনো দ্বীপে অবস্থান কর, তোমাকে উপযোগী কাজগুলো তোমার নিজের করতে হবে। টিকে/বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে অত্যন্ত সৃজনশীল হতে হবে।

ঐ ধরনের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া তুমি বাড়ীতে শুরু কর না কেন?

অনুধ্যান

আমি সত্য কথা বলতে কি ভয় পাই! সত্যিকারভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে দ্বিধা যেন না করি।

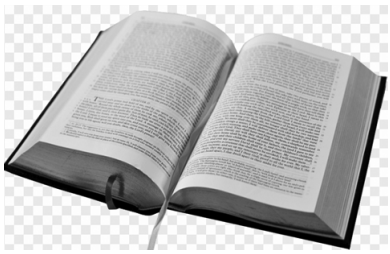

গ্রাম্য-প্রকৃতি

নিশির রোজারিও

নীল আকাশে সাদা মেঘের দল,
পূবালী হাওয়ায় উতলা আমার মন-
আমি কবি সবুজের মায়ায় করি বিচরণ।
নিভৃতে প্রকৃতির সাথে
বিলের জলে হাত রেখেছি হাতে-
কাকে রাখি মনের সাথে?
ছোট্ট মোর তরী,
ভাসিয়ে হই দেশান্তরী।
বৈঠার নাচন,
ক্ষুদ্র ঢেউয়ের কাঁপন।
মোর রোমাঞ্চকর ভাবনার খেলা,
কাটিয়ে দিলাম কত বেলা!
কখনো বা নির্ঝরিণীর গায়ে
নৌকা বেয়ে চলা,
বাতাসের সাথে কথা বলা।
আমি বসে ভাবি, আঁকি, দেখি, মাখি
প্রকৃতি।
কি আনন্দ!
কি কষ্ট সব ছেড়ে যাবো তেড়ে
এক ব্যস্ততম যান্ত্রিক নগরীতে।
আবার কবে আসিব, ভালোবাসিব
সবুজ প্রকৃতি, নীল আকাশ,
নির্ঝরিণীর জল, মোর সেই ছোট্ট তরী।

প্রার্থনা

প্রিয়তম প্রভু, আমার সম্ভবনাময় জীবনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাকে আশীর্বাদ কর। আমার মধ্যে যে সকল অনুগ্রহ, গুন দিয়েছ, তা যেন মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারি। আমি যেন শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখি। যে ভাবে স্কুলে, সেভাবে বাড়ীতে যেন আচরণ করি। মানুষের সাথে যেন নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা বলতে পারি।

- আমেন।

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

ফাদার রবার্ট এস্তোরিনোঃ এশীয় মণ্ডলীর গণমাধ্যম অগ্রদূত

ফাদার রবার্ট এস্তোরিনো (ফাদার বব নামে সমধিক পরিচিত) নিউ ইয়র্ক শহরের একটি হাসপাতালে বিগত ২৫ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক শতবর্ষী মিশনারী ধর্মসংঘ মেরীনল সম্প্রদায়ের যাজক। রবার্ট এস্তোরিনোর জন্ম নিউ ইয়র্ক শহরে ২৭ মে,

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। যাজকীয় প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মেরীনল যাজক হিসেবে অভিষেক লাভ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিদ্যায় এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ফাদার বব ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে হংকং-এ মিশনারী হিসেবে কাজ করতে আসেন। প্রাথমিকভাবে তিনি একদল মেরীনল যাজকের সাথে চাইনিজ ভাষা শেখেন এবং পরবর্তীতে তাদের সাথে চীনের মূল ভূখণ্ড হতে হংকং-এ পালিয়ে আসা শরণার্থী এবং তাদের যুব সন্তানদের মধ্যে কাজ করেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি হংকং ধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ প্রেরণ কাজে মনোনিবেশ করেন এবং পরবর্তীতে সেটা এশীয় কাথলিক মণ্ডলীর জন্য তার আজীবনের পালকীয় ও মিশনারী সেবাকাজে পরিণত হয়। তিনি হংকং ধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশন ও সেটার কার্যালয় স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৫-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হংকং-এর চাইনিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও সংবাদধর্মী লেখার বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ফাদার বব ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হংকং-এ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কাথলিক সংবাদ মাধ্যম ইউনিয়ন অব কাথলিক এশিয়ান নিউজ (UCAN) প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুদীর্ঘ ৩০ বছর প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন।

মূলত এশীয় কাথলিক মণ্ডলীগুলোর মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদান এবং ইউরোপ, আমেরিকা তথা বিশ্ব মণ্ডলীর কাছে এশীয় কাথলিক মণ্ডলীর কার্যক্রম, সাফল্য, চ্যালেঞ্জ, সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরতেই ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হংকং-এ তিনি ইউকানের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ১৪টি সংবাদ ব্যুরো স্থাপিত হয়, যা ২২টির মত দেশকে ইউকানের কভারেজে নিয়ে আসে।

একজন সুদক্ষ সাংবাদিক, গণমাধ্যম অগ্রদূত ও শিক্ষক হিসেবে তিনি বছরের পর বছর এশিয়ার নানা দেশ চষে বেরিয়েছেন। অজস্র প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা করে বহু কাথলিক সাংবাদিককে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাধ্যমে কাজ করার দক্ষতা অর্জনে অসামান্য সহায়তা করেছেন। এছাড়াও ফাদার বব এশীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (FABC)-এর একজন উপদেষ্টা এবং ভাতিকানের পোপীয় সামাজিক যোগাযোগ পরিষদের (PCSC)-এর একজন সদস্য হিসেবে অনেক বছর দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশেও তিনি বেশ কয়েকবার আসেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর প্রতি তার মূল্যায়ন ছিল খুবই ইতিবাচক। তার মতে, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী খুব ক্ষুদ্র হলেও দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার চেতনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, স্থানীয় মণ্ডলী শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং উপাসনার সংস্কৃতায়ন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাস্তবিক অর্থেই ফাদার রবার্ট এস্তোরিনো একজন মহান মিশনারী ছিলেন।

স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় হোক অস্ত্র ক্রয়ের অর্থ : *কোভিড-১৯ বিষয়ক ভাতিকান কমিশন*

গত মঙ্গলবার (৭/৭/২০২০) কোভিড-১৯ বিষয়ক ভাতিকানের কমিশন এক সংবাদ সম্মেলন করেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- কোভিড ১৯ সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যতকে প্রস্তুত করা। বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, করোনাভাইরাস মহামারী নানাভাবে দেখিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশ্বব্যাপী আমাদের দুর্বলতার চিত্র। আর তাই তারা বলেন, অস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী সামরিক ব্যয় ছিল ১.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাজেটের ৩০০ গুন বেশি। ভাতিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন দপ্তরের প্রিফেক্ট ও কোভিড ১৯ বিষয়ক ভাতিকান কমিশনের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল টার্কশন বলেন, সংহতির বিশ্বায়ন দরকার। বর্তমান সময়েও সামরিক খাতে প্রচুর পরিমাণে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অসুস্থ, দরিদ্র, প্রান্তিক জনগণ ও সংঘাতের শিকার ব্যক্তিরা বর্তমান সংকটে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এখনও অবধি, পরস্পরযুক্ত সংকটগুলো (স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত) শুধুমাত্র ধনী-দরিদ্রদের মধ্যেই নয়, কিন্তু শান্তি, সমৃদ্ধি, পরিবেশগত ন্যায্যতা এবং সংঘাত ও বঞ্চনার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যেও ব্যবধান বাড়িয়ে তুলছে। তাই সংঘাত কমানোর মধ্য দিয়েই অন্যায্যতা কমানো সম্ভব।

রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার অনলাইন পরিষেবার রূপকার ফাদার রেমণ্ড আম্ব্রোজ এর স্বর্গযাত্রা

গত ৭ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দের এক সুন্দর সকালে হার্ট অ্যাটাক করে আন্দ্রা প্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদের "হোম ফর দ্য ডিসএবোল্ড" এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফাদার রেমণ্ড আম্ব্রোজ। এফএবিসি-ওএসসি'র প্রাক্তন নির্বাহী সেক্রেটারী ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার সুদীর্ঘকালের পরামর্শক ফাদার রেমণ্ড আম্ব্রোজের আকস্মিক মৃত্যুতে এশিয়ান বিশপস কনফারেন্সের ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল চার্লস বো গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি, বিশেষভাবে ফাদার রেমণ্ডের বড়ভাই বিশপ ইভন আম্ব্রোজের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। একইসাথে শোক প্রকাশ করেছেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসিসহ সিবিসিবি'র বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জেমস রমেন বৈরাগি।

ফাদার রেমণ্ড আম্ব্রোজ মণ্ডলীর প্রতি ভালবাসায় পরিপ্লুত একজন ধির-স্থির ও শান্ত মিশনারী। তিনি তার সমস্ত শক্তি ও কর্ম-উদ্দীপনা ব্যয় করেছেন প্রভুর কাজের জন্য।

(৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জাফলং ধর্মপল্লীতে বিপ্লব কুজুরের ডিকন প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান

বিশপ বিজয় ওএমআই ও ফাদার রোনাল্ড কস্তার সাথে ডিকন বিকাশ কুজুর (ক্রস চিহ্নিত)

ওয়েলকাম লম্বা ▮ গত ১৭ জুন, রোজ রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলংয়ে সেমিনারীয়ান বিপ্লব কুজুরের ডিকন প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এতে ১জন বিশপ, ২জন যাজক সহ মোট ৬০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ। তিনি খ্রিস্টযাগে বাণী পাঠের পূর্বে প্রার্থীকে সামনে আহ্বান করেন। এরপর যথারীতি উপদেশ শুরু হয়। বিশপ তাঁর উপদেশে বলেন- বিপ্লব কুজুরকে ঈশ্বর আহ্বান করেছেন। তিনি অনেক চড়াই উৎড়াই পার হয়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি ডিকন প্রার্থীর মনোয়নের গুরুত্ব এবং দেহ রক্তের পর্ব সর্ম্পকে সুন্দর উপদেশ বাণী রাখেন। আমরা সবাই তাঁর সেবাকর্মী। আমরা যেন আমাদের জীবনাচারণের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের জীবন সাক্ষ্য বহন করতে পারি। উপদেশের পরে ডিকন প্রার্থী সামনে এসে জানুপাত করে বিশপ মহোদয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এই খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে প্রার্থীর জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে ডিকন প্রার্থী বিপ্লব কুজুরকে ফুলের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। বিপ্লব কুজুর তিনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন। তিনি আজ আনন্দিত। অনেকের প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তিনি আজ এ পর্যন্ত এসেছেন। ঈশ্বর তাঁর সেবা কাজের জন্য তাকে বেছে নেওয়ার ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ জানান। এই মহা দুর্যোগে যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি তাদের ও ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত বিশপ মহোদয় এবং ভক্তজনগণ যারা এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে সহায়তা করেছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এক আনন্দঘন ও প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দুপুর ১২টায় মিনিটে এই ডিকন প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'গুরু সাধনা সুরে গানে" বই-এর মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▮ গত ২৫ জুন রাজশাহী বিশপ ভবনে যাজকদের নিয়ে অধিবেশন শেষে প্রতিবেশীতে প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত লেখক ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জয়গুরুর) 'গুরু সাধনা সুরে গানে' বই-এর মোড়ক উন্মোচন করেন রাজশাহী ডাইয়োসিসের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। সাথে উপস্থিত থাকেন ভিকার জেনারেল ফাদার পল গমেজ এবং যাজকদের ডিন ফাদার ইম্মানুয়েল কাঁনন রোজারিও।

উল্লেখ্য, লেখকের অসুস্থ্য হবার পূর্বে তিনি রচনা করেছেন গুরু সাধনা সুরে গানে বইটি। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, বইটি যেন যাজকদের অধিবেশনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। আর তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে আংশিকভাবে। কেননা তার অসুস্থ্যতার কারণে তিনি নিজে এতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই বিশপ জের্ভাস রোজারিও 'গুরু সাধনা সুরে গানে' বইটির মোড়ক উন্মোচন করতে গিয়ে বলেন, ফাদার জয়গুরু অসুস্থ্যতার কারণে যদি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে নেই- তবে তিনি যে আমাদের

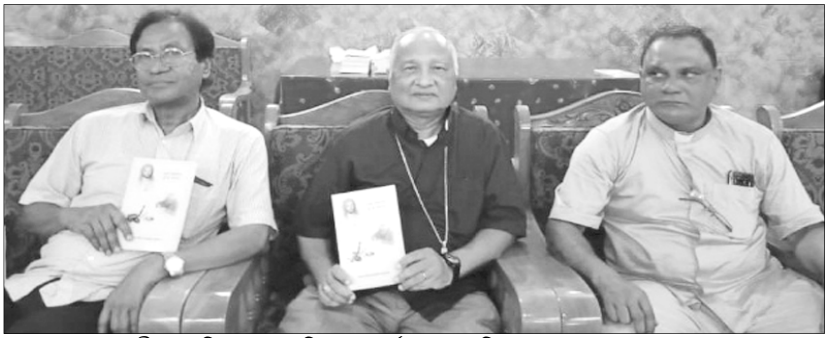

ফাদার সুনীল ডানিয়েল *বিশপ জের্ভাস রোজারিও* *ফাদার পল গমেজ*

ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছেন, তার সে সমস্ত কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে তার লেখনীর জন্য এবং আজকে আমরা যে বইটির মোড়ক উন্মোচন করতে যাচ্ছি তার জন্য। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে, তিনি আমাদেরকে ফাদার জয়গুরুর মত একজন দক্ষ ফাদারকে আমাদের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের জন্য দান করেছেন। বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ফাদার জয়গুরু উপস্থিত থাকতে না পারলেও তার মনের অভিপ্রায়টি ফাদার ইম্মানুয়েলের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। তাই বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ফাদার ইম্মানুয়েল বলেন, 'ফাদার জয়গুরু একটি বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তার এই বইটি যেন যাজকদের সভায় উদ্বোধন করা হয় এবং প্রত্যেক যাজককে একটি করে বই উপহার দেয়া হয়।' বইটির মোড়ক উন্মোচনের পর সকল যাজকের হাতে একটি করে বই উপহার হিসেবে তুলে দেয়া হয়। আমরা ঈশ্বরের কাছে ফাদার জয়গুরুর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি॥

(বরেন্দ্র দূতের সৌজন্যে)

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৪
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার রেমন্ড আম্ব্রোজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গীয় পিতার কাছে

ফাদার রেমন্ড আম্ব্রোজ আজ সকালে (৭ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে) পরম পিতার সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার কনসালটেন্ট (পরামর্শক) ছিলেন। একইসাথে এশিয়ান বিশপ কনফেডারেশন-সামাজিক যোগাযোগ অফিসের নির্বাহী সেক্রেটারী হিসেবে এশিয়া মহাদেশকে সেবা দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন দরদী বন্ধু হিসেবেও তিনি পরিচিত। বিশেষভাবে যোগাযোগ ও প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সরাসরি সহায়তা করেছেন। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বর্তমান প্রেস গড়ে ওঠতে তার সহায়তা যেমন ছিল তেমনি ভবিষ্যতের খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পুন:নির্মানকল্পে পরামর্শ, পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা দিয়েও তিনি সহায়তা করে যাচ্ছিলেন।

বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন কৃতজ্ঞতার সাথে তার অবদানের কথা স্মরণ করে তার আত্মার কল্যাণ কামনা করছে। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 24
❖ 12 - 18 July , 2020 , ২৮ আষাঢ় - ৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে কার্ডিনাল মহোদয়ের শোক বার্তা

কিংবদন্তী আমাদের প্রিয় শিল্পী এন্ড্রু কিশোর আর আমাদের মাঝে নেই। তার মৃত্যুতে গোটা জাতি শোকাহত আর খ্রিস্টান সম্প্রদায় গভীরভাবে মর্মাহত। তবে তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন মাটির মানুষের কণ্ঠশিল্পে ও বাংলার সঙ্গীতজগতে। তার অনন্ত শান্তি কামনা করি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রিয়জনদের জানাই খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও
ঢাকার আর্চবিশপ

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোর আর নেই

এন্ড্রু কিশোর শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। বাংলার সঙ্গীত জগতে এক ধ্রুবতারা তিনি। তার সুরে ব্যথাতুর মানুষের অন্তরে জাগতো আশা ও আনন্দ। সঙ্গীত সম্রাট এন্ড্রু কিশোর দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগের সাথে সংগ্রাম করে অবশেষে স্বর্গীয় পিতার ডাকে সাড়া দিয়েছেন ৬ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। তার তিরোধানে হাজারো মানুষ হয়েছে ভারাক্রান্ত।

দেশীয় সঙ্গীত জগতে বীরদর্পে পদচারণার সাথে সাথে খ্রিস্টীয় সঙ্গীতেও রেখেছেন বিশেষ অবদান। বাংলাদেশ বিশপ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠান বাণীদীপ্তি রেকর্ডিং স্টুডিওতেও গেয়েছেন বেশ কিছু গান। 'ক্রুশ বয়ে ত্রাণপতি', 'হেমন্তের স্নিগ্ধ শুভ্রপ্রাতে', 'ক্রুশের চিহ্নে আমি হয়েছি চিহ্নিত' গানগুলো মানুষের হৃদয়ে এখনো দোলা জাগায়।

সকলের প্রিয়, নম্র, ভদ্র ও সরল প্রকৃতির এন্ড্রু কিশোরকে হারিয়ে সকলেই শোকে স্তব্ধ। দেশ যেমন খ্যাতিমান শিল্পীকে হারালো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও একজন কীর্তিমান গুণী শিল্পীকে হারালো। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগের পক্ষ থেকে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় এন্ড্রু কিশোরের আত্মার চিরশান্তির জন্য করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। এন্ড্রু কিশোরের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে দয়ালু ঈশ্বর এ ভীষণ বিয়োগ ব্যথা বহন করার ধৈর্য ও শক্তি দান করুন।

– পরিচালক, বাণীদীপ্তি রেকর্ডিং স্টুডিও

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**